পঞ্চম অধ্যায়

উপন্যাস

এ কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে ছোটগল্পকার সুবোধ ঘোষ অনেক ক্ষেত্রেই ঔপন্যাসিক সুবোধ ঘোষকে ছাপিয়ে গিয়েছেন। তবে উপন্যাস রচনাতেও যে সুবোধ ঘোষ যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন, তাতে সন্দেহ নেই। সংখ্যার বিচারে তাঁর ছোটগল্পের পরিমাণ যথেষ্ট বেশি হলেও, উপন্যাসের সংখ্যাও বড় কম নয়।

সর্বমোট তেত্রিশটি রচনাকে লেখক উপন্যাসের স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিলাঞ্জলি (১৯৪৪), শতভিষা (১৯৪৫), একটি নমস্কারে, গঙ্গোত্রী (১৯৪৭), ত্রিযামা, সুজাতা, শ্রেয়সী, পুনর্ণবা, বহুত মিনতি, শুন বরনারী (১৯৫৭), শতকিয়া, রূপসাগর (১৯৫৮), সীমন্ত সরণী, বর্ণালী (১৯৫৯), মুক্তিপ্রিয়া, নাগলতা, নবীন শাখী, মীন পিয়াসী (১৯৬০), ভিতর দুয়ার, কান্তিধারা, বন-উপবন, ছায়াবৃতা, দেহ ও দেহী (১৯৬১), বসন্ত তিলক, ভিলামাধবী, জিয়াভরলী (১৯৬৩), বন্ধু গোলাপ (১৯৬৯), বাসবদত্তা (১৯৭০), এসো পথিক, জল কমল, দুই গন্ধর্ব (১৯৭২), কালকেতু (১৯৭৩) এবং সেই অদ্ভুত অভ্রখনি (১৯৭৭)।

উপন্যাসের ক্ষেত্রে সুবোধ ঘোষের প্রবেশ স্বপ্রণোদিত এবং কিছুটা আকস্মিকও বটে। সুবোধ ঘোষ তাঁর প্রথম ছোটগল্প 'অযান্ত্রিক' লিখেছিলেন অন্যের তাগিদে, আর প্রথম উপন্যাস তিলাঞ্জলি রচনা করেছেন নিজের তাগিদে। অযান্ত্রিক লিখেছিলেন বন্ধু সাহিত্যিক এবং সাহিত্যরসিকদের অনুরোধে নিতান্ত বাধ্য হয়েই। কিন্তু সুবোধ ঘোষ তাঁর প্রথম উপন্যাস তিলাঞ্জলি ছাপার অনুরোধ নিয়ে নিজেই এসেছিলেন 'দেশ'-এর সম্পাদক সাগরময় ঘোষের কাছে। প্রচার বিমুখ এবং 'ফরমারেসি লেখা' লিখতে একেবারেই অনভ্যস্ত সুবোধ ঘোষের জীবনে, নিজের লেখা ছাপানোর জন্য, এটাই ছিল প্রথম এবং শেষ অনুরোধ। সুবোধ ঘোষের এই উপন্যাস, তিলাঞ্জলি রচনা সম্পর্কে সাগরময় ঘোষ লিখেছেন —

> সেই সময় বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রচন্ড ঝড় বয়ে চলেছে। জাতীয় নেতারা সবাই কারাবন্দী, সেই সময় কলকাতায় 'জনযুদ্ধওয়ালা'দের দাপটে সবাই তটস্থ, হঠাৎ সুবোধবাবু রুখে উঠলেন, বললেন, সাগরবাবু আমি দেশ পত্রিকায় একটা উপন্যাস লিখতে চাই, আপনি ছাপবেন ? সুবোধবাবু তখন ছোটগল্প লেখক হিসেবে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। 'অযান্ত্রিক' ও 'ফসিলের' মত গল্প নিয়ে আলোচনা তখন প্রায় সবারই মুখে মুখে ফিরছে। উপন্যাস লেখায় তিনি তখনও হাত দেননি। তাঁর এই সঙ্কোচপূর্ণ প্রস্তাবে আমি সম্মত হলাম এবং উপন্যাসের বিষয়বস্তু নিয়ে আমাদের মধ্যে বেশ কয়েকদিন আলোচনাও হলো। তারপর দেশ পত্রিকায় শুরু করলেন উপন্যাস, নাম দিলেন 'তিলাঞ্জলি'।[১]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে এবং পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত 'তিলাঞ্জলি'তে রাজনীতি এসেছে প্রত্যক্ষভাবে। সুবোধ ঘোষ, প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে ইংরেজ শাসকদের মুখোমুখি ভারতবর্ষের দুই রাজনৈতিক শিবির কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের উপস্থিত করে, তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক বক্তব্য তুলে ধরেছেন। তাই সঙ্গত কারণেই উপন্যাসটিকে ঘিরে অনেক বিতর্কের ঝড় উঠেছে।

তিলাঞ্জলি নিয়ে বিতর্কের সূচনা হয়, যখন উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত

হতে থকে, তখন থেকেই। প্রকৃতপক্ষে শুধু বিতর্ক নয়, সমালোচিত রাজনৈতিক দলটির সক্রিয় বিরোধিতায়, উপন্যাসটির পুস্তকাকারে প্রকাশও এক সময় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। সাগরময় ঘোষ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> উপন্যাসটিতে সেই সময়ের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ডামাডোলের ছবি যেভাবে তুলে ধরেছিলেন তা বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের উষ্মার কারণ ঘটিয়েছিল। পরবর্তীকালে কলেজ ষ্ট্রীটের কোন এক বিখ্যাত প্রকাশক পুস্তকাকারে বইটি প্রকাশের সব আয়োজন যখন সম্পূর্ণ করেছিলেন, তখন বেশ কিছু লোক তাঁকে ভয় দেখিয়েছিলেন যে, এই বই প্রকাশ করলে তাঁকে জেলে যেতে হবে। স্বভাবতই প্রকাশক কিছুটা আতঙ্কগ্রস্ত হয়েই আমার কাছে ছুটে এলেন পরামর্শের জন্যে।
>
> সুবোধবাবু সেই সময় কঠিন অস্ত্রোপচারের জন্য নীলরতন সরকার হাসপাতালে শয্যাশায়ী ছিলেন। প্রকাশককে জনালাম আপনি হাসপাতালে সুবোধবাবুর সঙ্গে দেখা করে আপনার কথা বলুন, তিনি যা নির্দেশ দেবেন তাই করা যাবে। সুবোধবাবু প্রকাশককে জানালেন – আপনি সাগরবাবুকে বলুন, তিনিই এর একটা উপায় বের করতে পারবেন। প্রকাশক আবার হন্তদন্ত হয়ে এলেন আমার কাছে। তখন আমি তাঁকে বললাম, আপনার 'তিলাঞ্জলি' বই যখন ছাপা, বাঁধা সবই শেষ তখন কি করলে আপনি বাজারে বই বার করতে পারেন ? উনি বললেন – প্রকাশক হিসাবে অন্য কারও যদি নাম দেওয়া যায় বা ছাপা যায় তাহলে আমার দিক থেকে বই বার করার আর কোনও অসুবিধা হবে না। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁকে বললাম – সুবোধবাবুর এই বইয়ের প্রকাশক হিসেবে আপনি আমার নাম ও ঠিকানা দিতে পারেন। আমি নিজে জেলখাটা লোক, জেলে যেতে আমার আপত্তি নেই। বইটির প্রথম সংস্করণে প্রকাশক হিসাবে আমার নাম ছেপেই বেরিয়েছিল এবং তার জন্য আমাকে জেল খাটতে হয়নি।[২]

সমস্ত প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে তিলাঞ্জলি উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালে। এ সময় ভারতবর্ষের বিশেষত অবিভক্ত বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পালাবদলের এক মহাসংকটকাল। একদিকে সদ্য সমাপ্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ানক অভিজ্ঞতায় মানুষ বেঁচে থাকার নিত্য সংগ্রামে দিশেহারা, অন্যদিকে কাঙ্খিত স্বাধীনতা লাভের বাস্তব সম্ভাবনায় উদ্বেল দেশবাসীর 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন'। একদিকে বঙ্গভঙ্গের জিগির নিয়ে রাজনৈতিক শলা-পরামর্শ এবং শান্তিপ্রিয় মানুষের আশংঙ্কা, অন্যদিকে বাংলার পঞ্চাশের মহামন্বন্তরে অসহায় মানুষের করুণ বিলাপ। – বাংলা এবং, বাঙালীর জীবনের এই অস্থিরতাই সম্ভবত সুবোধ ঘোষকে অনুপ্রাণিত করেছিল 'তিলাঞ্জলি' রচনা করতে।

তিলাঞ্জলি, বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে, দুর্ভিক্ষের সংকটকালকে নিয়ে রচিত একমাত্র উপন্যাস নয়। মন্বন্তরের দুর্বিপাকে বিপর্যস্ত অভিজ্ঞতাকে নিয়ে বিভীষিকাময় বাস্তব চিত্র আমরা পেয়েছি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মন্বন্তর' এবং নবেন্দু ঘোষের 'ডাক দিয়ে যাই' উপন্যাসেও। একই বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে রচিত এই উপন্যাসগুলোর সঙ্গে সুবোধ ঘোষের তিলাঞ্জলির দৃষ্টিভঙ্গির এক মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। অন্যান্য সাহিত্যিকদের রচনায় যখন এই বিপর্যয়ে মানুষের করুণ পরিণতির বাস্তব চিত্র আঁকা হয়েছে অনাচার, ব্যাভিচার এবং সমাজিক অবক্ষয়ের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তখন, তিলাঞ্জলিতে, মহামন্বন্তরের বাস্তব চিত্র এবং অন্নকষ্টের দুর্বিসহ বর্ণনাকে ছাপিয়ে গিয়ে, মনুষ্যসৃষ্ট এই মন্বন্তরে অপমানিত মানুষের অন্তরাত্মার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে। এই অপমানের জ্বালায় মানবতাবাদী লেখক সুবোধ ঘোষ, তাঁর

নিজস্ব বিশ্বাস এবং ভাবনায় সমাজের সর্বস্তরে এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী করেছেন এক 'ভ্রান্ত রাজনীতি'কে এবং এক বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শকে। তাই তিলাঞ্জলিতে লেখকের রাজনৈতিক বক্তব্য যত বেশি প্রাধান্য লাভ করেছে, উপন্যাসের চরিত্রগুলো তত বেশি স্বাভাবিকতা অর্জন করতে পারে নি। লেখকের বক্তব্য প্রতিষ্ঠার তাগিদেই যেন তিলাঞ্জলির চরিত্রগুলোর স্বচ্ছন্দপ্রকাশ বিঘ্নিত হয়েছে –বিভিন্ন সমালোচকের এই সাধারণ অভিযোগ অস্বীকার করার উপায় নেই।

তিলাঞ্জলির ইন্দ্রনাথ যেন সুবোধ ঘোষেরই প্রতিমূর্তি। ইন্দ্রনাথ কমিউনিস্ট হয়েও কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে। সুবোধ ঘোষও কমিউনিস্ট বন্ধুদের ঘনিষ্টতা ছেড়ে কংগ্রেসের মতাদর্শে বিশেষত গান্ধীবাদে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। এই প্রসঙ্গে দীপেন্দু চক্রবর্তী বলেছেন —

> সুবোধ ঘোষ একদা ছিলেন কমিউনিস্টদের আপনজন। তাঁর গল্পকার হবার গল্পটিতে কমিউনিস্টদের একটা ভূমিকা ছিল। কতিপয় বামপন্থী বুদ্ধিজীবিদের একটি সাহিত্য পাঠের আড্ডায় তিনি বাধ্য হন একটি গল্প লিখে পাঠ করতে- সেটিই হলো বিখ্যাত – অযান্ত্রিক গল্প, যা আনন্দবাজারে প্রকাশিত হয়। চল্লিশের দশকের আনন্দবাজার আর আজকের আনন্দবাজারে বিস্তর ফারাক মতাদর্শে ও মনোভাবে। তখন বেশ কিছু প্রগতিবাদী লেখক ও সংবাদিকের প্রাধান্য থাকায় আনন্দবাজার কমিউনিজম বিরোধী শিবির হয়ে ওঠে নি। সুবোধ ঘোষের দ্বিতীয় গল্প 'ফসিল' বার হয় যে পত্রিকায় সেই 'অগ্রণী' ছিল কমিউনিস্টদের একটি বিশেষ সংস্কৃতিক গোষ্ঠীর পত্রিকা।
>
> ফসিল গল্পের নাট্যরূপ 'অঞ্জনগড়' ছিল একসময় প্রগতিবাদী থিয়েটারের একটি জনপ্রিয় প্রযোজনা। সুতরাং বলা যাবে না যে সুবোধ ঘোষ বহিরাগতের চোখ দিয়ে দেখেছেন চল্লিশের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে। বলা যাবে না যে তিনি শুরু থেকেই জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে। এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে বোধহয় তুলনা চলতে পারে অরওয়েলের, যিনি স্প্যানিশ সিভিল ওয়ারে কমিউনিস্টদের কাছে থেকে দেখে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন এবং একাধিক গ্রন্থে তা প্রকাশ করে গেছেন। তবে তাঁকে কখনও 'গড দ্যাট ফেইলড্' শিরোনাম দিয়ে এমন রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখতে হয় নি যেখানে মত-পরিবর্তনের জন্য জনসমক্ষে জবাবদিহি অনিবার্য হয়ে ওঠে। ...সুবোধ ঘোষের সঙ্গে কমিউনিস্টদের ঘনিষ্ঠতা থাকা সত্বেও তিনি কমিউনিজম সম্পর্কে সেই উৎসাহ কখনই দেখান নি যাতে তাঁর পরবর্তী রাজনৈতিক অবস্থান সবার পক্ষেই কৌতুকর হতে পারে। স্বল্পকালীন নৈকট্যে কমিউনিস্টদের প্রতি যে-অনুরাগের জন্ম তাই অভিজ্ঞতার আঘাতে অশ্রদ্ধায় রূপান্তরিত হয় – সুবোধ ঘোষের এই দিক-পরিবর্তনের ইতিহাসটায় তেমন জটিলতা আছে বলে মনে হয় না।[৩]

তিলাঞ্জলিতে সুবোধ ঘোষ ভারতীয় কমিউনিস্টদের এক অতি বিতর্কিত নীতির সর্বৈব বিরোধিতা করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র আক্রান্ত হওয়ার পর ভারতীয় কমিউনিস্টরা সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশকে মিত্রশক্তি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের জনযুদ্ধের নীতি অনুযায়ী বৃটিশ শক্তিকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, সেদিনের সেই নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে আজও এ দেশের কমিউনিস্টদের মধ্যে বিতর্ক রয়ে গিয়েছে। ভারতীয় কমিউনিস্টদের সেদিনের সেই তত্ত্বটিকে, বিশেষত সেদিনের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে জনযুদ্ধে রূপান্তরিত করার কমিউনিস্টদের যুক্তিকে, সুবোধ ঘোষ মেনে নিতে পারেন নি। এই বিশ্বযুদ্ধকে কেন্দ্র করে ভারতের প্রধান দুই রাজনৈতিক শিবির, কংগ্রেস ও

কমিউনিস্টরা দুই ভিন্ন মেরুতে অবস্থান করেছিল, — এ কথাও ঐতিহাসিক সত্য। কংগ্রেসীদের যখন একমাত্র লক্ষ্য ছিল ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান তখন, জনযুদ্ধের তত্ত্ব অনুসারে কমিউনিস্টদের লক্ষ্য ছিল যে কোন মূল্যে বৃটিশ শাসকদের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করা।

উপন্যাসটিতে কংগ্রেস এসেছে স্বনামে। লেখক কমিউনিস্টদের উপস্থিত করেছেন খানিকটা বেনামে, জাগৃতি সঙ্ঘ'র ছদ্মনামে। চল্লিশের গোড়ায় ভারতীয় কমিউনিস্টরা রাজনৈতিক আন্দোলনের তুলনায় 'সাংস্কৃতিক জাগরণের এর উপরই বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এই তথ্যের বিচারে কমিউনিস্ট পার্টির পরিবর্তে জাগৃতি সঙ্ঘ ছদ্মনামটি-নিতান্ত বেমানান হয়নি।

শুধুমাত্র ভারতীয় কমিউনিস্টদের তত্ত্বের বিরোধিতা নয়, সুবোধ ঘোষ কঠোর সমালোচনা করেছেন দলের নেতাদের চারিত্রিক অসংগতিরও। তিলাঞ্জলিতে বিভিন্ন চরিত্রগুলোর মুখে লেখকের এই সমালোচনা ধ্বনিত হয়েছে। উপন্যাটির এক জায়গায় আশুবাবু বলছেন, — 'আপনাদের কমিউনিস্ট পার্টির পাটিত্ব হয়তো আছে, কমিউনিজম নেই'।

কমিউনিস্ট তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ যে কতটা অমানবিক হতে পারে, তা লেখক বর্ণনা করেছেন অত্যন্ত কঠিন ভাষায়। লেখকের এই বর্ণনাটুকু যে কোন নীতিনিষ্ঠ কমিউনিস্টকে আহত করবে সন্দেহ নেই। দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের সম্পর্কে উপন্যাসটিতে কমিউনিস্টদের বক্তব্য —

> আমরা ওদের কানে কানে শুধু কেড়ে খাওয়ার মন্ত্র পড়ে দেব। ...যারা সাড়া দেবে তাদেরই আমরা সঙ্ঘবদ্ধ করবো। তারা মানুষ। তাদের ভিখিরী হতে দেব না। যারা সাড়া দেবে না তারাই ভিখিরী। তাদের নিয়ে আমাদের কোনো কাজ নেই। তার যাতে না খেতে পায়, আমরা বরং সেইদিকে লক্ষ রাখবো। সেই অপদার্থ শবগুলি পচে যাক, আমরা তারজন্য দু:খিতও নই। পতিতপাবন সমাজ-সংস্কারকরা তাদের নিয়ে মাথা ঘামাক। (তিলাঞ্জলি)

কমিউনিজমের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ইন্দ্রনাথ, প্রকাশ ও ঊর্মিলার প্রেমালাপ শুনে বলে —

> জীবনে অনেক দু:খ কষ্ট সহ্য করেছেন, অনেক আঘাত নির্যাতন সহ্য করেছেন, কিন্তু তার ফলে আপনাদের মনুষ্যত্ব বলিষ্ঠ হয় নি প্রকাশবাবু। ভেতরে যে এতখানি ক্ষয় হয়ে গেছেন এতটা বুঝে উঠতে পারিনি। ঊর্মিলা কাঞ্জিলালকে বিয়ে করবেন, সেটা দোষের কিছু নয়। মানুষের ইতিহাসে চিরকাল এ রকম ব্যতিক্রম চলে আসছে। কিন্তু পাপটা কোথায় হলো জানেন ? পাপ হলো ঐ ছুতোগুলো – পলিটিকস, প্রগ্রেস ও আদর্শের ছুতো।(তিলাঞ্জলি)

উপন্যাসে বর্ণিত কমিউনিস্ট পার্টির 'গূঢ় তত্ত্ব এবং লঘু ক্রিয়া' সম্পর্কে ইন্দ্রনাথের কঠোর সমালোচনা —

> 'কাজকে ফাঁকি দিতে গিয়ে আপনারা পার্টিকে এক বাবাজীর আখড়া করে ফেললেন, ধর্মের ভড়ং দিয়ে আখড়ার ব্যবসা বেশ তাড়াতড়ি জমে ওঠে'।

কমিউনিস্ট চরিত্রের ত্রুটি বিচ্যুতি প্রমাণ করতে কমিউনিস্ট চরিত্রগুলোকে যেভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হয়েছে কংগ্রেসী চরিত্রগুলো বিশ্লেষণের জন্য লেখক সে তাগিদ অনুভব করেন নি। তিলাঞ্জলিতে অবনী, তার স্ত্রী অরুণা এবং বোন জ্যোৎস্নাই কংগ্রেসী চরিত্র। কংগ্রেস কমিউনিস্ট দলের তুলনায় উন্নততর এবং গ্রহণযোগ্য এক রাজনৈতিক সংগঠন, লেখকের এই বিশ্বাস যেন সরাসরি পাঠকের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোন ঘটনা বা বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে পাঠকের কাছে কংগ্রেসের গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করা হয় নি। অথচ কমিউনিস্টদের ভ্রান্ত আদর্শ এবং কমিউনিস্ট নেতাদের চরিত্রের অসঙ্গতি

প্রমাণের জন্য অনেক যুক্তি তর্ক ও বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে, অনেকটাই মাত্রতিরিক্তভাবে। লেখকের এই পক্ষপাতদুষ্টতার অভিযোগ এনেছেন, অনেক সমালোচকই।

কমিউনিস্ট দলের কর্মী ইন্দ্রনাথ এসে যোগ দেয় কংগ্রেসে এবং কংগ্রেসের আদর্শ বর্জন করে শিশির এসে যোগ দিয়েছে জাগৃতি সঙ্ঘে। কিন্তু অবনী প্রথম থেকেই গোড়া কংগ্রেস কর্মী। যদিও ইন্দ্রনাথ এবং শিশিরের রাজনৈতিক আদর্শ পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় মানসিকতার পরিবর্তনের স্তরগুলো সুস্পষ্ট হয় নি, তবুও তাদের দলবদলের জন্য যথেষ্ট না হলেও, কিছু ঘটনা আছে। কিন্তু অবনীর কংগ্রেসকে কট্টর সমর্থনের পেছনে না আছে কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ, না আছে ইতিহাস। দীপেন্দু চক্রবর্তীর ভাষায় —

> অবনী গোড়া থেকেই কংগ্রেসী। তার কমিউনিস্ট রাজনীতির বিরোধিতায় কোন নাটকীয় চমক নেই। ...তারাশঙ্করের ধাত্রীদেবতায় শিবনাথ তার পরিবার–পরিবেশ যুগের হাওয়া সবকিছুর ভেতর বাল্যকাল থেকেই বিকশিত হয় গান্ধীবাদের দিকে। অবনীর যেন কোন বাল্যকাল নেই, অতীত নেই, শুধু আছে এক সংগ্রামী বর্তমান আর দীপ্যমান ভবিষ্যৎ।[৪]

উপন্যাসের শেষেও কংগ্রেসকে জিতিয়ে দিয়েছেন সুবোধ ঘোষ। ইন্দ্রনাথের সঙ্গে অবনীর মতাদর্শগত ভিন্নতা একসময় প্রায় বন্ধুবিচ্ছেদের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু অবনী গ্রেপ্তার হলে অন্যদের সঙ্গে ইন্দ্রনাথও অরুণাকে গিয়ে অভয় দিয়ে বলে আসে, সেও তার সঙ্গে আছে। কংগ্রেস যেন জাতীয়তাবাদের স্থির লক্ষ্যে একে একে সবাইকে নিয়ে আসে এক মঞ্চে।

তিলাঞ্জলিতে একদিকে রয়েছে দুটি ভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শের উৎকর্ষ বিচার, অন্যদিকে রয়েছে মহামন্বন্তরের বিপর্যয়ে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের দু:সহ অবস্থা। পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে রচিত অন্যান্য লেখকদের রচনায় সাধারণ মানুষের দু:খ দুর্দশার যে এক করুণ রসের সৃষ্টি হয়েছে, তিলাঞ্জলিতে সেই একই দু:খ দুর্দশা কারুণ্যকে ছাপিয়ে গিয়ে এক গভীর আত্মগ্লানিতে পর্যবসিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন —

> তিনি (সুবোধ ঘোষ) এই আশ্রয়চ্যুত, অণু-পরমাণুতে বিচ্ছিন্ন সর্বস্বহারা নিরন্নদের অভিযানে এক উৎকট বীভৎসতা ও অসংগতিই লক্ষ করিয়েছেন। তাঁহার বর্ণনা তীব্রশ্লেষাত্মক মন্তব্য ও উপমা নির্বাচন সমস্তই ইহার করুণ রসের দিকটা আড়াল করিয়া ইহার শোচনীয় অসামঞ্জস্যের দিকটাই বড় করিয়া তুলিয়াছেন। বিপিন, টুনার মা, টুনা ও পুনি কেউটানি সকলে মিলিয়া যে বায়ুবিতাড়িত শুষ্ক পত্রের ন্যায় একটা প্রেতনৃত্যের ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি করিয়াছে তাঁহার কারুণ্য অপেক্ষা বীভৎসতাটাই চিত্তকে বেশী অভিভূত করে। শোকের পরিমিত বর্ণনা সমবেদনার উদ্রেক করে, যখন ইহা উৎকট অসামঞ্জস্য ও উন্মাদ বিশৃঙ্খলার রূপ পরিগ্রহ করে তখন ইহার প্রতিক্রিয়া হয় গভীর আত্মধিক্কারের জুগুপ্সায়। নরক-যন্ত্রণার দৃশ্য যদি মর্তলোকবাসীর সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হয়, তবে এক ন্যক্কারজনক অনুভূতির চাপে পিষ্ট হইয়া তাহাদের স্বাভাবিক সমবেদনা অসাড় হইয়া পড়ে।[৫]

দুর্ভিক্ষের মহাবিপর্যয়কে সম্মুখে রেখে লেখক দেখিয়েছেন, কিভাবে মানুষের অন্তরাত্মা প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত হচ্ছে। লেখকের শিল্পীমানস মানবাত্মার এই অবমাননায় বেদনাহত হয়ে প্রতিবাদে সরব হয়েছে। তাঁর এই প্রতিবাদের প্রকাশই ঘটেছে এই উপন্যাসে এবং অনেক ক্ষেত্রেই তীব্রভাবে। মানবাত্মার অপমানকে ধিক্কার জানাতে গিয়ে লেখক তার সৃষ্ট চরিত্রগুলোকে অনেক ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে

পারেন নি। সম্ভবত এই কারণেই শিশির ও সীতার প্রণয়কাহিনীও স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠেনি। শিশির দেশপ্রেমিক এবং শিল্পসাধক। শিল্পসাধনার মধ্য দিয়েই সে দেশসেবার আদর্শ গ্রহণ করেছে। শিশির তার আদর্শ এবং মনোভাব পরিবর্তন করেছে একাদিক্রমে। কিন্তু তার এই পরিবর্তন মেনে নেবার মত গ্রহণযোগ্য কোন কারণ লেখক উপস্থাপিত করেন নি।

এই একই অসামঞ্জস্য সীতা চরিত্রেও লক্ষ করা যায়। সীতা প্রেম ও ঐশ্বর্যের পরস্পরবিরোধি আদর্শের দ্বন্দ্বে এক অস্থির চরিত্র। যদিও সমগ্র উপন্যাসটিতে সীতা চরিত্রই প্রেম ও দ্বন্দ্বে ভরপুর, সর্বাপেক্ষা জটিল এবং সযত্ন চিত্রিত। সীতার প্রেমের সঠিক মূল্যায়ন করেছে তার এক প্রত্যাখ্যাত প্রেমিক জয়ন্ত মজুমদার। জয়ন্ত বলেছে — 'সে নিজেকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসে না। প্রেমের সুকুমার অনুভূতি ও আদর্শবাদ—এই সমস্তর উদার আত্মবিলোপী হৃদয়াবেগের অন্তরালে সে এক বদ্ধমূল আত্মপ্রীতিকেই পোষণ করে এসেছে।'

উপন্যাসটি পূর্বাপর পাঠে দেখা যায় যে লেখকের নিজস্ব প্রকাশনৈপুণ্যে কোনও ঘাটতি নেই। ভাষারীতির নৈপুণ্য রয়েছে, রয়েছে আর্থ-সামাজিক অবস্থার বাস্তব চিত্রও। কিন্তু তবুও তিলাঞ্জলি প্রকৃত রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠতে পারে নি। মনেহয়, সুবোধ ঘোষ তাঁর একমুখী রাজনৈতিক বক্তব্য প্রতিষ্ঠায় অতিরিক্ত মনোযোগী হওয়ার ফলে, বক্তব্যের সঙ্গে সৃষ্ট চরিত্রগুলোর সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারেননি।

তিলাঞ্জলি সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামগ্রিক বিশ্লেষণ এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীকুমারবাবু বলেছেন —

> উপন্যাসটির মধ্যে লেখকের অভ্যস্ত প্রকাশনৈপুণ্য, ভাষার তীক্ষ্ণ সাংকেতিকতার প্রাচুর্য ও স্থানে স্থানে বিশ্লেষণকুশলতা থাকলেও রাজনৈতিক পরিমন্ডলের সহিত ব্যক্তিগত জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের নিবিড় সমন্বয় সাধিত হয় নাই। আঙ্গিকের শিথিলতা, ঘটনাবিন্যাসের স্বেচ্ছাচারিতার জন্য বিভিন্ন অধ্যায়ের বিচ্ছন্ন রসধারা এক অপরিহার্য ঐক্যের দিকে অগ্রসর হয় নাই। অনেক সময় ক্ষণস্থায়ী আবেগ ফুটাইয়া তুলিবার মোহে চিরন্তন রসবিশুদ্ধির দাবী রক্ষিত হয় নাই। ছোট গল্পের ও উপন্যাসের আঙ্গিকের পার্থক্য লেখক এখানে সম্পূর্ণ অধিগত করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।[৬]

সুবোধ ঘোষের প্রথম উপন্যাস তিলাঞ্জলিতে সাধারণভাবে যে অভিযোগগুলো উঠেছে, তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'শতভিষা'ও সে সমস্ত অভিযোগের অনেকগুলো থেকেই মুক্ত নয়। শতভিষাতেও সুবোধ ঘোষ তাঁর একটি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য কতগুলো চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। এই চরিত্রগুলো লেখকের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় তাদের অপরিহার্য ভূমিকাটুকু পালন করেছে মাত্র, ঘটনার মধ্য দিয়ে স্বাভাবিকত্ব এবং বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি।

যে বিশেষ তত্ত্বটি লেখক এই উপন্যাসে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, তা হচ্ছে – জীবনের জন্যই আদর্শ, আদর্শের জন্য জীবন নয়। তিনি দেখাতে চেয়েছেন, স্বাভাবিক এবং সতঃস্ফূর্ত জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে মানুষ যেই আদর্শকে বিশ্বাস করে আঁকড়ে ধরে, সেই আদর্শই তাকে পরিপূর্ণতা দান করে। জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন নির্দিষ্ট একটি আদর্শ কখনো মানুষকে তার কাঙ্খিত জীবনের পরিপূর্ণতায় পৌঁছে দিতে পারে না।

উপন্যাসটিতে, রজনী মিত্র একদা বিপ্লবী ছিলেন। তিনি নিজেকে একজন প্রকৃত আদর্শবাদী বলে মনে করেন। আদর্শনিষ্ঠাই তাঁর জীবনের প্রথম ও শেষ কথা। আদর্শ রক্ষার তাগিদে তাই যে কোন অপরাধও রজনী মিত্র মেনে নেন, কিন্তু আদর্শহীন কোন কাজই তার কাছে ক্ষমার যোগ্য নয়। রজনীবাবু

তার তথাকথিত আদর্শ রক্ষার জন্য প্রত্যাখ্যান করেছেন এক নারীর প্রেমকে। পরিবর্তে তার রাজনৈতিক আদর্শের সমধর্মিতার জন্য বিবাহ করেছেন এক জমিদার পুত্রের সুন্দরী বিধবা স্ত্রীকে।

রজনী মিত্রের এই আদর্শসর্বস্বতা যে ভন্ডামীরই নামান্তর এবং আদর্শ সম্পর্কিত তার এই তত্ত্বটি যে ভ্রান্ত, তা প্রামাণ করতে লেখক কাহিনীটিকে বিস্তৃত করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন চারটি প্রধান চরিত্র, যতি, মঞ্জু, মিনু, ও অমিয়। বড়ছেলে যতি এবং দুই মেয়ে, মঞ্জু ও মিনু নিজ নিজ রাজনৈতিক আদর্শের সমধর্মী জীবনসঙ্গী খুঁজে নিয়েছে এবং আদর্শবাদী রজনীবাবুর ক্ষমাও পেয়েছে।

ছোটছেলে অমিয় কিন্তু নিছকই ভালবাসার টানে বিবাহ করেছে পাশের বাড়ীর শুভাকে। অমিয় ও শুভার প্রণয় ও বিবাহ শুধুই হৃদয়াবেগতাড়িত। কোন বাহ্যিক আদর্শের সমধর্মিতা তাদের পরিণয়ের ভিত গড়ে নি। তাই রজনীবাবু তাদের ক্ষমা করেন নি, ক্ষিপ্ত হয়েছেন।

যতি নরেন মাস্টারের স্ত্রী সুলেখাকে বিবাহ করেছে, কৃষক সংগঠনের কাজ করতে গিয়ে। এই অনাচারকে রজনীবাবু মেনে নিয়েছেন। কারণ তিনি যতি এবং সুলেখার মধ্যে আদর্শের সমধর্মিতা খুঁজে পেয়েছেন। বড় মেয়ে মঞ্জুও কংগ্রেসের সমআদর্শে বিশ্বাসী নীহারকে বিবাহ করেছ – মেনে নিয়েছেন আদর্শবাদী পিতা। ছোট মেয়ে বিনুও নিজের পছন্দমত তার সোশালিস্ট আদর্শে বিশ্বাসী সাধনকে বিবাহ করেছে, তাকেও একইভাবে ক্ষমা করেছেন রজনীবাবু। কিন্তু তিনি কোনভাবেই ক্ষমা করতে পারেন নি, ছোট ছেলে অমিয়কে, কারণ অমিয় কোন বাহ্যিক আদর্শ ছাড়াই, শুধু ভালবেসে বিবাহ করেছে পাশের বাড়ির মেয়ে শুভাকে।

ঔপন্যাসিক সুবোধ ঘোষ রজনীবাবুর এই দুই ছেলে এবং দুই মেয়ের বিবাহ পরবর্তী জীবনের ঘটনাবলি বর্ণনা করে দেখিয়েছেন যে যতি, মঞ্জু, মিনু যে আদর্শের দোহাই দিয়ে বিবাহ করেছিল এবং রজনীবাবুর ক্ষমা লাভ করেছিল, তারা ক্রমে আদর্শচ্যুত হয়েছে। অন্যদিকে ছোট ছেলে অমিয় যে কোন বাহ্যিক আদর্শের মেয়েকে বিবাহ করে নি, জীবণের স্বাভাবিক ধর্মে, শুভাকে ভালবেসে বিবাহ করেছিল, সেই অমিয় এবং শুভা তাদের অন্তর থেকে উৎসারিত আদর্শে ব্রতী হয়ে, রজনীবাবুর আদর্শের ধারণাটাই বদলে দিয়েছিল।

কাহিনীতে দেখা যায়, যতি এবং সুলেখার বিবাহ বন্ধন টেঁকে নি, মঞ্জু ও নীহার তাদের প্রাক্-বিবাহ জীবনে যে রাজনৈতিক মতাদর্শে একে অন্যের সঙ্গী হয়েছিল, তার সেই আদর্শবোধ ভুলে গিয়ে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় মেতে উঠেছে, সোশালিষ্ট দম্পতি মিনু এবং সাধনের বিচ্ছেদ হয়েছে, সাধন পরিত্যাগ করেছে মিনুকে।

অন্যদিকে বিবাহ পরবর্তী জীবনে অমিয় এবং শুভা তাদের স্বাভাবিক জীবনপথে সত্যিকারের আদর্শ খুঁজে পেয়েছে। দেশসেবার আদর্শে ব্রতী হয়ে অমিয় ও শুভা এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছে এবং সরকারের রোষের শিকার হয়েছে। রজনীবাবুর হাতে তাদের একমাত্র শিশুসন্তানকে সঁপে দিয়ে অমিয় ও শুভা শুদ্ধ আদর্শে অবিচল থেকে কারাবরণ করেছে।

অমিয়-শুভার শিশুসন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর্শবাদী রজনীবাবু নতুন করে আদর্শের সংজ্ঞা উপলব্ধি করেছেন। রজনীবাবু বুঝতে পেরেছেন, বহিরঙ্গ আদর্শের বাড়াবাড়িতে জীবন পূর্ণতা লাভ করতে পারে না, আদর্শের মোড়কে জীবনকে বেঁধে রাখা কখনো স্বাভাবিক নয়। বরং সত:স্ফূর্ত জীবনের সচ্ছন্দ প্রকাশের মধ্য দিয়ে মানুষের অন্তরে যে আদর্শবোধ জেগে উঠে, সেই আদর্শবোধই জীবনকে পরিপূর্ণতার পথ দেখাতে পারে।

তিলাঞ্জলি এবং শতভিষা এই দুটি উপন্যাসেই সুবোধ ঘোষ নিজের বিশ্বাস এবং তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য

এমন একটি করে চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, যাদেরকে লেখকেরই মুখপাত্র বলা যেতে পারে। তিলাঞ্জলিতে ইন্দ্রনাথ এবং শতভিষাতে পুঁটিমাসী লেখকের হয়ে কথা বলেছে। শতভিষায় পুঁটিমাসীর কাছে রজনী মিত্রের আদর্শবাদ, বাহ্যিক আড়ম্বর বলেই ধরা পড়েছে। কারণ পুঁটিমাসী লক্ষ্য করেছে যে রজনীবাবু তার যৌবনে এক নারীর সত:স্ফূর্ত প্রেমকে উপেক্ষা করে একজন জমিদারের অসামান্যা সুন্দরী পুত্রবধূকে বিবাহ করেছিলেন আদর্শের সমধর্মিতার জন্য নয়। এই অসামান্য রূপের আকর্ষণেই রজনীবাবু জমিদার পুত্রবধূকে বিবাহ করেছিলেন তবে অবশ্যই তার আদর্শের আড়ালে। পুঁটিমাসী লেখকের হয়ে প্রমাণ করেছেন যে রজনীবাবুর আদর্শবাদ ছিল ভন্ডামীরই নামান্তর।

'একটি নমস্কারে', সুবোধ ঘোষের প্রথম উপন্যাস 'তিলাঞ্জলি' এবং আলোচ্য উপন্যাস 'একটি নমস্কারে' দুটিই রচিত হয়েছে ভারতবর্ষের প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের অস্থির রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। তিলাঞ্জলির কমিউনিস্টদের তত্ত্ব ও চরিত্রের কঠোর সমালোচনা এই উপন্যাসে অনুপস্থিত। প্রকৃতপক্ষে কমিউনিস্টদের প্রসঙ্গই ওঠে নি এই উপন্যাসে। বরং গান্ধীজীর নেতৃত্বে অহিংস আন্দোলন যে কিভাবে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষকেও স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তাই লেখক ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। এই উপন্যাসে, '৪২ এর 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন প্রবাহের পাশাপাশি বয়ে চলেছে একটি প্রেমের ধারা; একটি অন্যটিকে পরিপুষ্ট করেছে, সংঘাতের সৃষ্টি করেনি। প্রেম এসেছে জাতিভেদ এবং অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আত্মসুদ্ধি ঘটিয়ে।

সুবোধ ঘোষ বিশ্বাস করতেন, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল দুটি ধারা অহিংস ও সহিংস পথের মধ্যে গান্ধীজীর অহিংস পথটিই ছিল শ্রেয়তর। গান্ধীবাদের প্রতি তাঁর এই অখন্ড বিশ্বাসই পরবর্তীকালে তাঁকে 'অমৃত পথযাত্রী'র মত একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। একটি নমস্কারে উপন্যাসে লেখক গান্ধীজি এই অহিংস নীতির যথার্থতা প্রতিষ্ঠা সচেতনভাবেই। যদিও 'তিলাঞ্জলি' এবং 'একটি নমস্কারে' এই উপন্যাস দুটিতেই লেখক তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, তবুও 'একটি নমস্কারে' কখনো তিলাঞ্জলির মত রাজনৈতিক বক্তব্য সর্বস্ব হয়ে ওঠে নি।

উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র সোমা রায় একটি নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়ে। পিতৃহারা সোমা তার মা এবং দুই বোনকে ছেড়ে উপার্জনের তাগিদে ঘর ছেড়ে বের হয়। কলকাতায় চাকরির চেষ্টা করে সোমা উপলব্ধি করেছে, কলকাতায় চাকরি হয়ত মেলে কিন্তু সম্ভ্রম বজায় রাখা শক্ত। তাই বন্ধু ভদ্রার বাবা হিতেনবাবুর ব্যবস্থায় প্রত্যন্ত অঞ্চল কাঞ্চীপুরে এক স্বদেশী চাকরিতে যোগ দেয় সোমা। এই ষাট টাকার বেতনের চাকরিতে দেশ সেবার সুযোগ এক উপরি পাওনা। কারণ সোমা দেশ ও দশের সেবার জন্য ঐ চাকরিতে যোগ দেয়নি।

> চোখ বন্ধ করে নিজের মনের ভিতর তাকিয়ে সোমা আজ বুঝতে পারে, সে সত্যিই চাকরি করার টানে এখানে অসেনি। দেশ সেবার আগ্রহেও নয়। সব দিক দিয়ে তার মুক্তির পথ অবরুদ্ধ ছিল, তাই স্বেচ্ছায় নিজেকে নির্বাসিত করার জন্যই যাত্রা করে এই অজ্ঞাতলোকে চলে এসেছে। নইলে, কী এমন চাকরি ? মাইনে তো ষাটটি টাকা।[৭]

রেল স্টেশনে নামার পর যে যুবকটির তত্ত্বাবধানে সোমা কাঞ্চীপুরের গ্রাম্য পথে যাত্রা শুরু করে। সে একজন অন্তজ, জাতে পাটনি, নাম প্রবীর। সোমার মন ক্রমশ ভাঙতে থাকে শ্রীহীন গ্রামের চেহারা দেখে, গ্রামের মানুষদের দেখে, যেই চিলড্রেনস হোমের সুপারিন্টেন্ডেন্ট হয়ে কাঞ্চীপুরে এসেছে, সেইসব শিশুদের হত-দরিদ্র চেহারা দেখে। অন্যদিকে সোমার অন্তরের অন্য একটি দিক ক্রমশ ভরে ওঠে

প্রবীরকে দেখে, গুরুর প্রতি প্রবীরের একলব্যের মত নিষ্ঠা দেখে। প্রবীরের গুরু, অহিংস মন্ত্রে দীক্ষিত কাব্যতীর্থ মশাইকে দেখে। প্রকৃতপক্ষে কাব্যতীর্থ এবং তার স্ত্রী শুচি তাদের অতি সহজ সরল জীবনযাত্রায় এবং আদর্শনিষ্ঠায় সোমার কাছে এক বিস্ময় হয়ে দাঁড়ায়। বিস্মিত সোমা যেন নিজেকেই প্রশ্ন করে — সত্যিই কি ওর নাম বিনোদ কাব্যতীর্থ, শুচিদির স্বামী, দুবেলা পেট ভরে খাওয়ার মত ভাত জোটে না, চাষীদের সঙ্গে সঙ্গে নিজের হাতে ঝুড়ি নিয়ে মরা কালিন্দীর হানা মাটি দিয়ে বাঁধে, মতিগঞ্জের নয়ন চৌধুরী যাকে জব্দ করার জন্য বৃত্তি বন্ধ করে? ...কাব্যতীর্থ মশাই কি সত্যই পৃথিবীর মানুষ?

প্রথম দর্শনেই প্রবীরের প্রতি এক মমত্ব জেগে ওঠে সোমার অন্তরে। 'সোমার কেমন মনে হয়, এই সাত্ত্বিক সাজ তবু ভদ্রলোকের চেহারাটাকে গরুগম্ভীর করে তুলতে পারেনি। যেন এক দুষ্টু ছেলের দৌরাত্মমাখা মূর্তি খদ্দরের শাসনে সংযত হয়ে আছে'।

ইতিমধ্যে প্রবীরের মুখেই জেনে ফেলেছে সোমা যে প্রবীর একজন পাটনি উচুঁজাতের কাছে সে অস্পৃশ্য। গ্রামসেবা কমিটির প্রেসিডেন্ট নয়ন চৌধুরীর একটি চিঠি পড়ে সোমা এ কথাও জানতে পেরেছে যে প্রবীর নয়ন চৌধুরীর আদেশেই তাকে যত্ন করে স্টেশন থেকে নিয়ে এসেছে, তার থাকার ঘরটি ভদ্রস্থ করে সাজিয়েছে এবং তার সমস্ত সুযোগ সুবিধার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখছে। শুধুই দায়িত্ব পালন, এর সঙ্গে প্রবীরের হৃদয়ের কোন সম্পর্ক নেই। এত কিছু জেনেও সোমা তার চিরন্তন নারী হৃদয়ের কোন এক খেয়ালে প্রবীরকে তার ঘরে এসে চা খাবার নিমন্ত্রণ জানিয়েছে — 'তারার মার কাছে শুনলাম, আপনি আমার ঘরের ভেতর ঢোকেননি, আমার জিনিসপত্র ছোঁয়া যাবে বলে। ধন্য আপনার সংস্কার। এতে যে আমার শিক্ষাদীক্ষাকে আপনি কতখানি ছোট করে দেখলেন, তা বোধ হয় বুঝতে পারেনি। যাই হোক, আপনাকেই আপনার ভুল শুধরে নিতে হবে। একবার আসবেন, এই ঘরেই চা খেয়ে যাবেন, কি ছোঁয়া গেল কি না গেল, তার জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না'।

ক্রমেই প্রবীরের প্রতি সোমার দুর্বলতা ধরা পড়ে। ভরাকুল থানা দখলের দিন প্রবীর ফেরে নি বলে অভুক্ত থাকে সোমা। তারার মারও চোখে পড়ে সোমার এই দুর্বলতা — 'প্রবীর মাস্টারও ফিরে এসেছে এবার তাহলে তুমি খেয়ে নাও'। সোমা তার অন্তরের সবটুকু ভালবাসা উজাড় করে দিয়ে প্রবীরকে পেতে চেয়েছে —

সোমা — আজ আমি তোমার কাছে একটি কথা চাইছি।
প্রবীর — বল।
সোমা — তুমি আমাকে কাঞ্চীপুর ছেড়ে যেতে দেবে না।
প্রবীর সোমার হাতটা শক্ত করে ধরে — তুমি নিজে না চলে গেলে আমি তোমাকে যেতে দেব না সোমা।[৮]

প্রবীরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার সুযোগে প্রবীরের জীবনের দুঃখের কথাও জেনেছে সোমা। এই বিশেষ একটি ক্ষেত্রে সোমা হার মেনেছে প্রবীরের কাছে আর সম্ভবত এ কারণেই সোমার নারীমন অনেক দ্রুত দ্রবীভূত হয়েছে প্রবীরের প্রতি।

> প্রবীর মাস্টারের মা ও শ্যামুর দিকে তাকিয়ে আজ যে দুঃখের রূপ দেখতে পেয়েছে সোমা, তার তুলনায় চক্রবেড়ের গলির দুঃখকে নিতান্ত অভিমানের ফ্যাশান বলে মনে হয়। কাঞ্চীপুর রোড স্টেশনের অন্ধকারে প্রথম যেদিন ট্রেন থেকে নেমেছিল সোমা, সেদিন তার মনে এই ধারণাটাই নিঃসংশয় হয়েছিল যে, সেই এই পৃথিবীর সব সুখের যোগ্য হয়েও বঞ্চিতা, মানিনী হয়েও অসম্মানিতা, ভাগ্যের কোলে জন্মেও দুর্ভাগ্যতাড়িতা। কিন্তু আর বোধ

হয় সে সোমা নেই, দুঃখের প্রতিযোগিতায় অন্তত একটি মানুষের কাছে সে আজ পরাজিত, সে হলো প্রবীর মাস্টার।[৯]

উপন্যাসে একদিকে এগিয়ে চলেছে গ্রামসেবার কর্মকান্ড, অহিংস আন্দোলন, সত্যাগ্রহ, কাঞ্চীপুরে আছড়ে পড়েছে মহাত্মা গান্ধীর ডাকে '৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ঢেউ, অন্যদিকে একইভাবে এগিয়ে চলেছে একটি প্রেমের ধারা। দেশপ্রেমের পথ ধরে এক নর-নারীর প্রেম যেন ক্রমশ তার পূর্ণতার পথে এগিয়ে চলেছে। দেশপ্রেম এবং একজোড়া নর-নারীর ভালবাসা কখনো একে অন্যের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়নি। তবে উপন্যাসটি পাঠে এক সময় অবশ্যই মনে হয় নর-নারীর হৃদয়ের প্রেম কি, দেশপ্রেম অথবা বিপ্লবের আদর্শকেও ছাপিয়ে গিয়ে জীবনের শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণ করতে চেয়েছে ?

এ প্রশ্ন জাগে শুচিকে বলা সোমার একটি ছোট্ট কথায় — 'আমার আশা খুবই ছোট শুচিদি, তবু এরই জন্য পড়ে থাকবো।'[১০]

আবার কাব্যতীর্থের প্রতি শুচির প্রেম ও ভালবাসাও যথেষ্ট ব্যক্তিকেন্দ্রিক। মস্ত বড় লোকের বাড়ির মেয়ে হয়েও শুচির অতি সাধারণ জীবনযাত্রা এবং আত্মত্যাগের পেছনে দেশাত্মবোধ কাজ করেছে বলে মনে হয় না। কারণ শুচি কাব্যতীর্থের সমস্ত আদর্শ সযত্নে পালন করে এসেছে কাব্যতীর্থ মানুষটিকে ভালবেসে। আর তাই কাব্যতীর্থের মৃত্যুর পরই, শুচি তার খড়মজোড়া তুলে নিয়ে পাকাপাকিভাবে কাঞ্চীপুর ত্যাগ করেছে। প্রকৃতপক্ষে কাব্যতীর্থের মৃত্যুর পরই শুচি চরিত্রটিরও যেন বিনাশ ঘটেছে। একইভাবে প্রশ্ন জাগে প্রবীরের দেওয়া সোমার একটি প্রশ্নের উত্তরকে ঘিরে —

সোমা — এ কাজের পালা কি ফুরোবে না ?
প্রবীর চুপ করে থাকে। সোমার হাত দুটি আর একটু শক্ত করে ধরে, যেন নিজেরই হৃদয়কে আরো কঠিন করে নিয়ে প্রবীর বলে — যেদিন এখানে এসে আর তোমাকে দেখতে পাব না। (একটি নমস্কারে)

অর্থাৎ প্রবীর যেন সোমার জন্যই দেশসেবা এবং দেশোদ্ধারের কাজে ব্রতী হয়েছে। সোমা যেদিন থাকবে না সেদিন তার এ কাজের পালা ফুরোবে। প্রবীরের কর্মযজ্ঞে সোমাই প্রাণ। সোমা মুখ্য, অন্যসব গৌণ।

তবে একই সঙ্গে এ কথাও সত্য যে লেখক মানবিক প্রেমকে দেশপ্রেমের উপরে স্থাপন করলেও গ্রামসেবা এবং দেশপ্রেম এই উপন্যাসে কখনো অপ্রাসঙ্গিক অথবা অবাঞ্ছিত মনে হয় নি। বরং সোমা ও প্রবীরের প্রেম, দেশপ্রেম এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলনকে এক নতুন মাত্রা দান করেছে।

তাই দেখা যায় কাব্যতীর্থ প্রাণত্যাগের পূর্বে প্রবীরের হাতে জল পান করেছে, সোমা এক বারবণিতার সন্তান ভোলাকে কোলে তুলে নিয়েছে। বৃটিশ শাসকের তাঁবেদার ডিএসপি, দত্ত, কংগ্রেসের যুযুধান দুই নেতা ভৈরববাবু এবং নয়ন চৌধুরীর সঙ্গে এক হয়ে নীচুজাতের প্রবীরের সঙ্গে উঁচুজাতের সোমার মিলনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েও হার মেনেছে, জাত রক্ষায় হার মেনেছে কলকাতা থেকে ছুটে আসা সোমার সেজকাকাও।

উপন্যাসটির অনেকগুলি গৌণ চরিত্র একমাত্রিক হলেও, উপন্যাসের অগ্রগতিতে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে এবং স্বাভাবিক কারণেই উল্লেখের দাবী রাখে। তারার মা চরিত্রটি দেশপ্রেমের নিষ্ঠায় উজ্জ্বল। সোমা তারার মাকে কত মাইনে পায় জিজ্ঞাসা করায় তারার মার উত্তর — 'মাইনে কই দেয় ? আমিও চাই না। বিনোদ পন্ডিত বলে, দেশের কাজ করবে তারার মা, তার জন্য আবার মাইনে কিসের ?'

শিশুভবনের সমস্ত কাজ একা হাতে করেছে তারার মা, সোমার দেখাশোনা করেছে আন্তরিকভাবে,

আবার সোমার ঘরে যখন গোরা পল্টনের আক্রমণ হয়েছে তখন এই পৌঢ়া তারার মা সোমাকে রক্ষা করতে রুখে দাঁড়িয়েছে —

> এক মহা নরকের আক্রমণ থেকে সোমাকে বাঁচাবার জন্য যেন তারার মার দুঃখে জীর্ণ চাকরানির শরীরটা অন্তত আজকের মতো যেন পাথরের বর্ম হয়ে উঠতে চাইছে।[১১]

অন্য একটি পার্শ্বচরিত্র, বারবণিতা সিন্ধু। নিজে বারবণিতা হয়েও তার ছেলে ভোলার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তাকে শিশুভবনে ভর্তি করেছে। অন্যদিকে শিশুভবনের অধ্যক্ষা সোমার সম্মান ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য নারীদেহলোভী গোরা পল্টনের কাছে নিজের দেহটি তুলে দিয়ে সমস্ত বিষ শুষে নিয়েছে।

'একটি নমস্কার' উপন্যাসে সুবোধ ঘোষ সচেতনভাবেই সহিংস আন্দোলনের তুলনায় গান্ধীজীর অহিংস এবং গ্রামসেবামূলক আন্দোলনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছেন। এই কারণেই উপন্যাসটিকে তত্ত্বমূলক উপন্যাস বললেও অন্যায় হবে না।

এই উপন্যাসে লেখক দেখিয়েছেন, কিভাবে অস্পৃশ্যতাকে মানুষ ক্রমশ বর্জন করেছে, কি ভাবে মানুষ উঁচু-নীচুর ভেদাভেদ থেকে মুক্ত হয়ে সমানাধিকার ও সহমর্মিতার আদর্শে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। বিনোদ কাব্যতীর্থ মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে অন্তজ প্রবীরের হাতে জল চেয়ে খেয়েছে, সোমা বারবণিতা সিন্ধুর ছেলে ভোলাকে গভীর মমতায় কোলে তুলে নিয়েছে; এবং সোমা নিজে উঁচুজাতের অনেক মানুষের সম্মিলিত প্রতিরোধ উপেক্ষা করে প্রবীরের প্রতি তার প্রেমের ঘোষণায় দৃপ্তকন্ঠ হয়েছে।

একই সঙ্গে সহিংস আন্দোলনের অসারতা, লেখক প্রমাণ করেছেন প্রবীরের মাধ্যমেই। প্রবীর তার গুরু কাব্যতীর্থের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধার কারণে কাব্যতীর্থের জীবদ্দশায় কখনো তার অহিংস নীতির বিরোধিতা করেনি। লেখক কিন্তু উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই প্রবীরকে 'নরসিংহ ভক্ত' হিসেবে চিহ্নিত করে রেখেছিলেন। ফলে পরবর্তীতে আমরা দেখি এই 'নরসিংহ ভক্ত' প্রবীর মানিক চৌকিদারের মৃত্যুদন্ডে সম্মতি দিয়েছে। কিন্তু তার এই সহিংস নীতি যে অভ্রান্ত ছিল না তা লেখক প্রমাণ করেছেন, প্রবীরকে মাণিক চৌকিদারের স্ত্রী মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়ে। গর্ভিনী মানিক চৌকিদারের বউ তখন আত্যহত্যা করতে চলেছে। অনুতপ্ত হয় প্রবীর —

> ভুল ভেঙে যায়। প্রতিশোধের থিওরীর মত এত বড় মূর্খ মনের সৃষ্টি সংসারে বোধ হয় আর নেই। অভিরামের কাঁধের উপরেই প্রবীরের মাথাটা অবশ হয়ে ঝুঁকে পড়ে। ভয়ঙ্কর যন্ত্রণায় পুড়ে পুড়ে প্রবীরের মনের ভিতর থেকে পুঞ্জীভূত একটা হিংস্র অন্ধকার নি:শ্বাসের বাতাস জ্বালিয়ে দিয়ে ছুটে বের হয়ে যায়। একটা করুণ আর্তনাদ অস্ফুট স্বরে বুক ঠেলে বের হয়ে আসে – মাপ কর, শাস্তি দাও।[১২]

সন্তানসম্ভবা মাণিক চৌকিদারের বৌকে শিশুভবনে তারার মার হাতে তুলে দিয়ে ভরাকুল থানায় আত্মসমর্পণ করে প্রবীর। সোমাকে চিরকালের মত আপন হয়ে থাকার আশ্বাস দিয়ে বিদায় নেয় শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রবীর। শেষাংশে যেন জীবনের জয়গান গাইতেই শিশুহীন শিশুভবনে জন্ম নেয় নতুন শিশু, মাণিক চৌকিদারের সন্তান।

গঙ্গোত্রী উপন্যাসেও রাজনীতি এসেছে, তবে বিষয়বস্তু হিসেবে নয়, পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে। ১৯৪৭-এ প্রকাশিত সুবোধ ঘোষের এই উপন্যাসটিকে তাই সঙ্গত কারণেই 'তিলাঞ্জলি' কিংবা 'একটি নমস্কারে'র মত রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত করা সঠিক হবে না। রাজনৈতিক ঘটনা উপন্যাসটির উপলক্ষ্য

মাত্র। এই উপলক্ষকে কেন্দ্র করেই মান্দার গ্রামের শান্ত জীবনযাত্রায় হঠাৎ ঝড় উঠেছে। মানুষের স্বাভাবিক হৃদয়ধর্ম আলোড়িত হয়েছে এই ঝড়ে। উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা যেন দিশাহীনভাবে এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে নোঙর করেছে। প্রকৃতপক্ষে হৃদয়ধর্মের এই অস্থিরতাই যেন উপন্যাসটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

উপন্যাসটিতে মানুষে মানুষে অন্তর সম্পর্কের মাত্রাতিরিক্ত জোয়ার ভাটায় এবং অহেতুক টানা-পোড়েনে, অনেক চরিত্রই বিভিন্ন কারণে পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারে নি। গঙ্গোত্রী সম্পর্কে লেখকের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ এনেছেন অনেকেই। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন —

> ...তিনি (সুবোধ ঘোষ) তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সাংকেতিক রীতি ও ভাবোচ্ছাস-প্রধান তির্যক বর্ণনাভঙ্গীর সাহায্যে এই সংঘাত সংকুল চিত্রটিকে ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু আসলে এই বিষয়টি এইরূপ আলোচনার উপযোগী নহে। সৃষ্ট চরিত্র সম্বন্ধে লেখকের গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও স্বচ্ছ পরিকল্পনা না থাকিলেও তাহারা পাঠকের আগ্রহপূর্ণ সমবেদনা উদ্রিক্ত না করিতে পারিলে তাহাদের জীবনসমস্যা চিত্রণে এইরূপ ব্যঞ্জনাগর্ভ কাব্যোচ্ছাস অপপ্রয়োগ বলিয়াই মনে হয়।[১৩]

উপন্যাসটির কয়টি প্রধান চরিত্র – মাধুরী, বাসন্তী, কেশব, অজয় এবং সঞ্জীববাবু। মাধুরী নায়িকা। মাধুরীর জীবনে ঝড় উঠেছে, কেশবকে দেওয়া প্রতিশ্রুতিকে কেন্দ্র করে। পরে পরিতোষকে ভালবেসেছে, কিন্তু সেই প্রেমও স্থায়িত্ব লাভ করেনি। অতি নগণ্য কারণেই পরিতোষের প্রতি তার অন্তর বিক্ষুব্ধ হয়েছে এবং শেষে আবার ভালবেসেছে অজয়কে। অন্যদিকে, বাসন্তী, কেশবের প্রতি তার একান্ত অনুরাগের কথা কখনো প্রকাশ করতে পারেনি। কেশবের প্রতি তার অনুচ্চারিত প্রেম বুকে চেপেই অন্য পুরুষকে বিবাহে সম্মতি দিয়েছে সে। তবে একই সঙ্গে তাঁর প্রাণপুরুষ কেশবের সঙ্গে মাধুরীর প্রেমে অসহ্য বাসন্তী অনবরত চেষ্টা করেছে, কেশব মাধুরী প্রেমপর্বের পরিসমাপ্তি ঘটাতে। পৌঢ় সঞ্জীববাবুর চরিত্রেও লেখক একই হৃদয়জনিত সমস্যার সৃষ্টি করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে বেশ কয়েক জোড়া নর-নারীর প্রণয়ঘটিত জটিলতর সমস্যা একযোগে উপন্যাসটিতে পরিবেশিত হওয়ায় পাঠকের রস আস্বাদনে বিঘ্ন ঘটে, কোন চরিত্রের সঙ্গেই পাঠকের অন্তর একাত্ম হতে পারে না। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই উপন্যাসটি সুখপাঠ্য হতে পারে নি। এই প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য —

> সমস্ত উপন্যাস ব্যাপিয়া অন্তর-সম্পর্কের জোয়ার-ভাটা খেলিয়াছে। কিন্তু ইহাদের ব্যক্তিগত জীবনে পাঠকের কিছুমাত্র আগ্রহ সৃষ্টি না করায় ও ইহাদের মানস পরিবর্তন পরম্পরার মধ্যে কোন নির্ভরযোগ্য কারণ না থাকায় ইহাদের সমস্ত দ্বন্দ্ব কেবল কথার মারপেঁচে পরিণত হইয়াছে।[১৪]

সুবোধ ঘোষের উপন্যাসগুলোর মধ্যে আমরা এ পর্যন্ত 'তিলাঞ্জলি', শতভিষা, 'একটি নমস্কারে' এবং 'গঙ্গোত্রী' সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছি। কিন্তু এদের কোনটাই সমালোচকদের বিচারে উপন্যাস হিসেবে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠতে পারে নি।

তিলাঞ্জলিতে ভাষার তীক্ষ্ণ সাংকেতিকতা রাজনৈতিক পরিমন্ডলের সঙ্গে সৃষ্ট চরিত্রগুলের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করতে পারেনি। লেখকের নিজস্ব একটি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রচিত 'শতভিষা' এবং 'একটি নমস্কারে' উপন্যাস দুটিতেও ব্যবহৃত ভাষার এই সাংকেতিকতা অনেক ক্ষেত্রেই অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছে। এই একই অভিযোগ উঠেছে 'গঙ্গোত্রী'র ক্ষেত্রেও। গঙ্গোত্রীতে সরল বিষয়বস্তু এবং গ্রামের সহজ জীবনযাত্রায় সুবোধ ঘোষের তির্যক এবং সাংকেতিক ভাষারীতি উপন্যাসটির রসাস্বাদনে বিঘ্ন ঘটিয়েছে।

তবে লেখকের ভাষার এই সাংকেতিকতা প্রকৃতই পরিপূর্ণতা লাভ করেছে 'ত্রিযামা' উপন্যাসে। এ প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন —

> তাঁহার এই রূপকধর্মিতা ইতিপূর্বে উপযুক্ত বিষয় ও পরিকল্পনার গভীরতার অভাবের জন্যই ব্যর্থ হইয়াছিল — ইহার ইতস্তত — বিক্ষিপ্ত আলোক কণাগুলি সংহত জ্যোতির্মন্ডলের পরিবর্তে একটা অস্পষ্ট মরীচিকার সৃষ্টি করিয়াছিল। বিশেষত রাজনৈতিক বিষয়ের মতবাদপ্রাধান্য ও বুদ্ধিসর্বস্বতা এইরূপ রহস্যদ্যোতনার পক্ষে ঠিক অনুকূল নহে। 'ত্রিযামা' উপন্যাসে তাঁহার শিল্পীমনের রূপকাকুতি এক আবেগভীর জীবনকাহিনীর সূক্ষ্ম অন্তর্দ্বন্দ্ব ও স্বচ্ছ আত্মবিকাশের মধ্যে নিজ ভাস্বর প্রতিচ্ছবি খুঁজিয়া পাইয়াছে।[১৫]

একটি ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনী নিয়েই উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। কাহিনীর তিনটি প্রধান চরিত্র কুশল, স্বরূপা এবং নবলা। আত্মাভিমানী এবং অহঙ্কারী কুশলের হৃদয় জুড়ে ছিল তার বাবার অধস্তন কর্মচারীর মেয়ে স্বরূপা। দশ বছর ধরে কুশল মনেপ্রাণে চেয়েছে ফুলবাড়ির মেয়ে স্বরূপাকে। কিন্তু তারপর কুশলের অন্তরে মোহ বিস্তার করেছে হ্যাপিনুকের প্রসাধন চর্চিতা এবং প্রগলভা-নবলা।

কুশলের আত্মাহঙ্কারের পেছনে রয়েছে তার প্রসংশনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, পুরাতত্ত্বের গবেষক হিসেবে স্বীকৃতি, যথেষ্ট পৈতৃক সম্পত্তি এবং এক সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত। এ সমস্ত কারণেই স্বরূপার একনিষ্ঠ প্রেমকে অবজ্ঞাভরে দূরে সরিয়ে রেখে ভোগবিলাসী নবলার আকর্ষণে মোহিত হয়েছিল কুশল। কিন্তু কুশলের এই মোহ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। একের পর এক বিপর্যয়ে তার জীবন দর্শনই বদলে যায়। রত্না ব্যাঙ্ক ফেল করে, বাবা মারা যান এবং সার্ভে অফিসের সুপারিন্টেন্ডেন্টের প্রায় নিশ্চিত চাকরিটিও হারায় কুশল। আত্মাহঙ্কারী কুশল সব হারিয়ে হীনমন্যতায় ভুগতে শুরু করে। নবলার সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়। বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কুশলের অন্তরে নতুন করে ভাঙা-গড়া শুরু হয়।

> ক্রমান্বয়ে প্রথমে নিজের অহঙ্কারকে জয় করা, দ্বিতীয়ত ব্যক্তিগত ঈর্ষাবোধকে নিয়ন্ত্রণে আনা, তৃতীয়ত অপরের বিদ্বিষ্ট কথায় বিদ্বেষ পোষণ না করা, চতুর্থত নিজেকে সংযত করা ও আপন লক্ষ্যে স্থির হতে পারা, পঞ্চমত উৎকোচ দূরে ঠেলতে পারার মতো মানসিক স্থৈর্য গঠন এবং ষষ্ঠত সাময়িক পরাজয়কে হাসিমুখে গ্রহণ করতে পারার মতো মহৎ গুণের সমাবেশে কুশল নিজের চরিত্রকে ষড়রিপুজয়ীরূপে প্রকাশিত করে।[১৬]

এ ভাবেই কুশল চরিত্রের এক বিবর্তন শুরু হয়। ক্রমশ তার চরিত্রে অস্থিরতা প্রশমিত হয়ে সদগুণগুলো ফুটে উঠতে থাকে। কঠিন বাস্তব পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে চরিত্রটি যেন তার অবাঞ্ছিত এবং ক্ষতিকারক মেদ বর্জন করে এক সুন্দর সুঠাম দেহ-সৌষ্ঠবের অধিকারী হতে চায় — পাশ করা শিক্ষিত ছেলে কুশল, কিন্তু আজকাল ওর চোখের দৃষ্টি ও মুখের ভাব দেখে মনে হয়, ওর শিক্ষা এবার শুরু হয়েছে মাত্র। যা শিখেছিল, সবই ভুলে গিয়েছে বোধহয়।

চরিত্রের এই বিবর্তনের মধ্য দিয়েই কুশল স্বরূপার প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করে এবং নিজেকে স্বরূপার প্রেমের যোগ্য করে তোলে একান্ত নিষ্ঠায়। যে কুশল নবলার মোহে অন্ধ হয়ে স্বরূপাকে বলেছিল — 'আমার জীবনে স্বপ্নে, সম্মানে, আকাঙ্ক্ষায় ও আদর্শে তুমি কোথায়? কিছুই নও, সে যোগ্যতা তোমার নেই'[২৩] সেই কুশলই নবলার প্রতি তাঁর মোহভঙ্গের পর 'ফুলবাড়ির মেয়ের রিক্ত মহিমা ও শুকতারার মেয়ের অস্থির আত্মরতির পার্থক্য' অনুভব করে —

যে শুধু বেদনা সহ্য করে – অথচ তার জন্য ক্ষোভ রাখে না, অভিযোগ করে না, প্রতিবাদ করে না, কত সুন্দর হয়ে ওঠে সে মানুষের রূপ। তার চোখের দৃষ্টি জ্যোৎস্নালোকের মতই উত্তাপহীন, আর প্রাণটা বেলাভূমির মত, সমুদ্রতরঙ্গের আঘাত বুক পেতে শুধু সহ্য করে সে ধন্য হয়ে আছে।[১৭]

কুশলের আত্মবিশ্লেষণ এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ পর্বে আমরা দেখি স্বরূপাই তার হৃদয়বৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করেছে, নবলা নয়। অতীতের সমস্ত ত্রুটি সংশোধন করে, কুশল যখন স্বরূপাকে তার একনিষ্ঠ প্রেমের স্বীকৃতিদানে প্রস্তুত হয়, ঠিক তখনই নবলার এক চিঠি, মিলনোন্মুখ দুটি হৃদয়ের মাঝে এক অনতিক্রম্য বাধার সৃষ্টি করে। সসংকোচে পিছিয়ে যায় স্বরূপার অন্তর, কুশলও স্বেচ্ছায় বিলম্বিত করে তার মিলনের মুহূর্ত। নিজের অন্তরকে আরো একবার যাচাই করে নিতে চায় সে। এমনকি দেবী রায়ের সঙ্গে নবলার বিবাহ হয়ে যাবার পর, যখন স্বরূপাকে গ্রহণ করার সমস্ত প্রতিবন্ধকতা অপসারিত, তখনও কুশলের আত্মসমীক্ষায় মনে হয়েছে যে সে হয়ত পুরোপুরি নবলার প্রতি উদাসীন হতে পারে নি এবং স্বরূপাকে একান্তভাবে পাওয়ার অধিকার জন্মায়নি। আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়া চলতে থাকে, একইসঙ্গে দীর্ঘতর হতে থাকে কুশল স্বরূপার মিলনের প্রতীক্ষা। কুশলের এই আত্মশুদ্ধির স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয় তারই লেখা শিবভারতের রূপ প্রবন্ধে — 'জীবনের ভুলের বেদনায় জ্বলে পুড়ে প্রায়শ্চিত্ত সেরে মানুষ আবার নির্ভুল হবার জন্য যখন পথ খোঁজে, তখন কত নতুন আর সুন্দর হয়ে ওঠে তার রূপ।'[১৮]

কুশলের লেখা প্রবন্ধটির এই অংশে সুবোধ ঘোষ প্রকৃতপক্ষে জীবনের রূপ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব অনুভবই প্রকাশ করেছেন। উপন্যাসের কাহিনীটি নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। জীবনের পর্বে পর্বে প্রাচুর্য আর দৈন্য, ভাল আর মন্দ, ত্যাগ আর ভোগ, হৃদয়হীনতা আর হৃদয়বত্তা, ফুলবাড়ি আর হ্যাপিনুকের বৈপরীত্যের মধ্যে চলতে চলতে কুশল জীবনসত্যের সন্ধান পেয়েছে। — 'কামরাঙ্গা গাছের পাতার ঝোপে উসখুস করে ঘুম ভাঙা নীলকন্ঠ পাখির মত' কুশল জীবনের অন্ধকার রাত অতিক্রম করে এক নতুন ভোরে পদার্পণ করে।

আমি একা নই, তুমি আছ আমার পাশেই, তুমি সুখী হলেই আমি সুখী, তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা।[১৯]

উপন্যাসের এই শেষ বাক্যটি আশা জাগায়, নির্ভরতার কথা বলে। উপন্যাসের প্রধান দুটি নারী চরিত্র, স্বরূপা এবং নবলার অবস্থান যেন দুটি ভিন্ন মেরুতে। স্বরূপা জীবন জুড়ে নীরবে প্রতীক্ষা করেছে আর নবলা অন্তহীন এবং আপাত ভোগ-বিলাসের পেছনে ছুটে বেড়িয়েছে। স্বরূপার কাছে প্রেম জীবনের এক পরম প্রাপ্তি অথচ একই প্রেম নবলার কাছে একান্ত অস্থায়ী এবং আটপৌরে ব্যবহারের সামগ্রী।

স্বরূপার দীর্ঘদিনব্যাপী নীরব প্রতীক্ষা ও বাহ্যবিক্ষেপহীন আকুলতা তার জীবন-সংগ্রামদীর্ন, দারিদ্র্যের আঁচে ঝলসানো রুক্ষ জীবনের কৃচ্ছসাধনের ছন্দে নিয়মিত। অপরদিকে নবলার ভোগৈশ্বর্যপুষ্ট নীতিজ্ঞানবর্জিত জীবন সংসারের অবিমিশ্র সুবিধাবাদের আরাম-শয়নে সুখসুপ্ত ও মাতৃশাসনের প্রখরতায় আত্মবোধহীন।[২০]

নবলা কুশলকে তার সুদিনে ভালবেসেছে আবার দুর্দশার দিনে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দেবী রায়কে কাছে টেনে নিয়েছে নিজের সুখ এবং ভোগ-বিলাসের উৎস হিসেবে। মাতৃশাসনের দাপটে অপরিণতমনা এবং পরমুখাপেক্ষি নবলার কাছে জীবনের কোন সুগভীর অর্থ নেই। তার ভালবাসা আবর্তিত হয়েছে 'খেয়ালী পরিবর্তনশীলতার অশান্ত ছন্দে।'[২১] দেবী রায়ের 'টু-সিটার কারটি প্রকৃতপক্ষে

নবলা ও দেবী রায়ের অন্তহীন সুখ এবং ভোগ-লালসা চরিতার্থ করার জন্য উদ্দেশ্যহীনভাবে ছুটে চলার প্রতীক।

নবলা চরিত্রে নারীসুলভ আত্মাভিমান অনুপস্থিত। এমনকি স্বামীর প্রতি স্ত্রীর একান্ত অধিকার সম্পর্কেও নির্লিপ্ত। নবলা তার প্রেমিক দেবী রায়ের সঙ্গে মার অবৈধ সম্পর্কের কথা জেনেও প্রকৃত অর্থে প্রতিবাদ করতে পারেনি। মা নন্দা দেবীর নির্লজ্জ যুক্তি ও শাসন মেনে সেই দেবী রায়কেই বিয়ে করেছে নবলা। এই বিয়ের ফলে নবলার অন্তরে কোন গভীর ক্ষতেরও সৃষ্টি হয়নি। বরং হেসে হেসে নবলা বলেছে — 'আমার স্বামীটাই জলে গেল।'

নবলার মা নন্দাদেবী পার্শ্বচরিত্র হলেও বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। কারণ, সুবোধ ঘোষের কথাসাহিত্যে এ ধরণের নারী চরিত্র এক বিরল সংযোজন। নন্দাদেবী যথেচ্ছাচারী, নীতিজ্ঞানবর্জিতা, শুচিতা এবং শালীনতাহীন প্রচন্ড ইচ্ছাশক্তি সম্পন্না এক নারী। লালসাময়ী নন্দাদেবী তাই সহজেই নিজ গর্ভজাত মেয়েকে উচ্চকন্ঠে বলতে পারে —

> দেবী তোকে ভালবাসে, আমাকেও ভালবাসে, কিন্তু তাতে হয়েছে কি ?...তুই ভালবাসিস দেবীকে, আমিও ভালবাসি, তাতেই বা হয়েছে কি ?[২২]

এ জন্য সমাজ কি ভাববে তা নিয়ে নন্দাদেবীর কোন মাথাব্যথা নেই —

> আমরা যাকে ভালবাসি, যে আমাদের ভালবাসে, তাকে নিয়ে আমরা আমাদের ইচ্ছেমত আনন্দ নিয়ে থাকবো। তাতে পৃথিবীর কোন হিংসুটের বুক ফাটছে আর কোন মুখ্খু হা-ভাতে নিন্দে করছে, তা আমরা গ্রাহ্য করবো কেন ?[২৩]

অন্যান্য চরিত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে কুশলের বাবা বিজয়বাবু, পাঠকজী এবং অনুপম। এ তিনটি চরিত্রের মধ্যে দিয়েই লেখক জীবনের পরিতৃপ্তি এবং সন্তোষ লাভের উপায় সন্ধান করেছেন। বিজয়বাবু যথেষ্ট পরিশ্রম করে অর্থোপার্জন করেছেন। কিন্তু শেষ জীবনে তিনি উপলব্ধি করেন —

> টাকার ওপর আমারও অনেক মায়া ছিল, এবং দিনের পর দিন টাকা জমিয়েও যাচ্ছিলাম। কিন্তু একদিন মনে হলো, ভুল হচ্ছে, বোঝা ভারি হচ্ছে, শেষদিনে শুধু টাকার জোরেই আনন্দ করে বিদায় নেওয়া যাবে না।[২৪]

এ পর্যন্ত মেনে নিতে পাঠক হিসেবে অসুবিধা হয় না। কিন্তু বিশ্বাস করতে বাধে যখন দেখি বিজয়বাবু একটি গল্প বলার মাঝে রত্না ব্যাঙ্ক ফেল করার খবর শুনে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে মুহূর্ত পরে একই সরস ভঙ্গীতে গল্পের অবশিষ্টাংশ বলতে শুরু করেন। সারা জীবনের গচ্ছিত ধন মার যাবার খবরে একশত শতাংশ নির্লিপ্ত থাকতে পারাটা খুব স্বাভাবিক মনে হয় না।

পাঠকজী অতি কষ্টে সংগ্রহ করা নিজের খাবারটুকু অন্যের হাতে তুলে দিয়ে বলেন-'সন্তোখ, সন্তোখ ! সন্তোখ চাই জীবনে বাস, তাহলেই তো হয়ে গেল ! আর কি চাই ? অনুপমও সেই একই সন্তোষ চায় জীবনে। হয়ত অনুপমের সন্তোষের সংজ্ঞা পাঠকজীর মত ততটা নির্ভেজাল নয়, কিন্তু মাটির অনেক কাছাকাছি, যথেষ্ট বাস্তবসম্মত —

> না দাদা, দু:খ-টু:খ আমার কিছু নেই। তবে ঐ রিসড়ের মাসি মাঝে মাঝে চিঠি লিখে দু-চার টাকা চেয়ে বসে, কিন্তু টাকা পাঠাতে পারি না, তাই মনটা একটু ছোট হয়ে যায়, এই যা।[২৫]

তাই জীবনে পরিতৃপ্তির লক্ষ্যে চিত্রিত তিনটি চরিত্রের মধ্যে অনুপমকেই আমাদের পরিচিত জীবনের কাছাকাছি মনে হয়।

উপন্যাসটি পূর্বাপর বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ত্রিযামায় বর্ণিত চরিত্রগুলো প্রায় সবই অত্যন্ত একমাত্রিক। যে ভালো, সে শুধুই ভালো। যে খারাপ সে পূর্বাপর খারাপ। স্বরূপার চরিত্রে নিন্দনীয় কিছু নেই, নবলা এবং তার মা নন্দাদেবীর চরিত্রে প্রশংসা করার কোন সুযোগ নেই। বিজয়বাবু যখন অর্থোপার্জন করেছেন, তখন তা মনেপ্রাণেই করেছেন, যখন তার অর্থোপার্জনের ঘোর কেটেছে তখন তা একেবারেই কেটেছে। কোন দ্বিধা নেই, কোন দ্বন্দ্ব নেই।

কুশল চরিত্রে, দ্বিধা দ্বন্দ্ব এবং পরিবর্তন আছে, কিন্তু এই দ্বিধা দ্বন্দ্ব ও পরিবর্তন এসেছে ছক বাঁধা পথ ধরেই। যখন তার যথেষ্ট সঙ্গতি ছিল, তখন সে সহজেই স্বরূপাকে ত্যাগ করে নিজেকে নবলার কাছে উৎসর্গ করেছে আবার সব হারিয়ে জীবনসত্যকে উপলব্ধি করে উপেক্ষিতা স্বরূপাকেই গ্রহণ করেছে। কাহিনীটির প্রাক-কথনেই লেখক এক অপ্রচলিত রীতিতে মুখ্য চরিত্রগুলোর আত্মদর্শন জানিয়ে দিয়েছেন পাঠকদের। পরে গোটা কাহিনীটিতে চরিত্রগুলো নিজ নিজ বৃত্তে সুস্থির থেকে নিজ নিজ পাঠ আবৃত্তি করে গেছে মাত্র।

তবে সুবোধ ঘোষের ভাষার সাংকেতিকতা এবং রূপকধর্মিতা এই উপন্যাসে সর্বার্থসাধক হয়ে উঠেছে। কারণ তিলাঞ্জলির মত রাজনৈতিক আদর্শ এবং মতবাদ ত্রিযামার বিষয়বস্তু নয়। এ কাহিনীর বিষয় মানুষের জীবনদর্শন যা ভাষার সাংকেতিকতা এবং রূপকধর্মীতার এক উপযুক্ত ক্ষেত্র।

কুশলের শিল্পানুরাগ, পুরাকীর্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণে নিষ্ঠা এবং মহিমা সমন্বিত শিলামূর্তিগুলির মানবিক আদর্শ কুশলকে তার আত্মবিশ্লেষণে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রেরণা যুগিয়েছে। এই মূর্তিগুলিই ঔপন্যাসিকের নিপুণ রূপকধর্মিতায় কুশলকে প্রভাবিত করে কাহিনীটির গতি প্রকৃতি এবং পরিণতি নির্ধারণ করেছে। অশোক রায় বলেছেন —

> আমার মতে প্রতিকের উদ্দেশ্য হলো মানুষের জীবনের চলতি পথের কতকগুলো নিশানায় দিশা ফুটিয়ে তোলার বিনিদ্র প্রহরীত্ব। যান্ত্রিক প্রাণ যখনই পথ হারাবে ক্লান্তিতে, অবসাদে কি পরাজয়ে – তখনি প্রতীকের সচল সংকেতময়তায় তাকে ভাবিয়ে ভাবিয়ে পথের সন্ধান পাইয়ে দেবে।[২৬]

ত্রিযামাতে ঘটেছে ঠিক তাই। হরভবনের প্রত্নতত্ত্বশালায় সে খুঁজে পেয়েছিল পাথরের খোদাই করা গঙ্গামূর্তি। এই প্রেমময়ী গঙ্গামূর্তিকে যিনি বক্ষে ধারণ করেন, সেই গঙ্গাধরের মূর্তির অন্বেষণ কুশলের প্রধান ব্রত হয়ে দাঁড়ায়। সাংকেতিক এই গঙ্গাধর মূর্তির অন্বেষণে, কিশোর খুঁজেছিল নিজেকেই। আর এই আত্মানুসন্ধানের মধ্য দিয়েই কুশল 'শ্রেয়'কে খুঁজে নিতে পারে এবং নিজেকেও তার উপযুক্ত করে তুলতে পারে। 'ত্রিযামা রাত্রি শেষ হয়ে আসে'[২৭] এক নতুন আলোর ভোরের সুস্পষ্ট আভাসে।

সুতরাং সুবোধ ঘোষের রচনাশৈলীর এক বিশেষ দিক তার ভাষার সাংকেতিকতা এবং রূপকধর্মিতা এই ত্রিযামা উপন্যাসে যে সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং এই প্রয়োগের ফলে, অধিকাংশ চরিত্র একমাত্রিক হওয়া সত্ত্বেও, উপন্যাসটি যে এক নতুন মাত্রা পেয়েছে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এই উপন্যাসটির সাফল্য সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

> সমস্ত উপন্যাসটির মধ্যে রূপকব্যঞ্জনার বহিরাবরণভেদী আলোক কুশল হস্তে, অভ্রান্ত সঙ্গতিবোধের সহিত বিন্যস্ত হইয়াছে। শুধু চরিত্র পরিকল্পনায় ও বিশ্লেষণে নহে, সাধারণ বর্ণনা ও আখ্যানের মধ্যেও এক তির্যক-প্রসারী রঞ্জন

> রশ্মির কম্পন অনুভব করা যায়। ত্রিযামা রজনীর নানা বিভীষিকাময় অন্ধকার প্রহরের আবর্তনের পরে ঊষার নির্মল জ্যোতির উদ্ভাসন, নীলকণ্ঠ পাখীর নীড় হইতে বাহিরে আসা, প্রভাত-আলোক পত্যুদগামী গীত সবই এই রূপকের রেশটি বহন করিয়া আনিয়াছে। মনস্তত্ত্বজ্ঞানের নিপুণ প্রয়োগ, আখ্যান-বস্তুর কুশল সন্নিবেশ ও সর্বোপরি বঞ্জনাবিন্যাসের সার্থক পরিবেশনে এক অপরূপ ভাবসঙ্গতিপূর্ণ আবহ-সৃষ্টিতে উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যের একটি বিভাগের শীর্ষস্থানীয় রূপে গণ্য হইতে পারে।[২৬]

সুবোধ ঘোষের প্রতিটি উপন্যাসেই এ পর্যন্ত আমরা দেখেছি যে লেখক তাঁর কাহিনীর মধ্য দিয়ে এক একটি তত্ত্ব, এক একটি বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে এগিয়ে গেছেন এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে কোথাও কোন আপোস করেন নি। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলোও যেন নিজ নিজ দায় দায়িত্ব বুঝে নিয়ে তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পথে যাত্রা করেছে। উপন্যাসগুলোতে ব্যবহৃত ভাষার সাংকেতিকতা এবং বিভিন্ন রূপকের প্রয়োগ Pilot Van এর মত চরিত্রগুলোর যাত্রাপথকে মসৃন করেছ। সুজাতা উপন্যাসও এর ব্যতিক্রম নয়।

এই উপন্যাসে গান্ধীবাদী লেখক ভারতীয় সমাজে জাত-পাতের বিচার এবং অস্পৃশ্যতা শুধুই যে এক অর্থহীন কুসংস্কার তা একটি সহজ সরল কাহিনীর মধ্য দিয়ে প্রতিপন্ন করেছেন। সুজাতা'র ভূমিকায় লেখক বলেছেন যে তাঁর রচিত একটি গল্প 'আত্মজা'র সঙ্গে এই উপন্যাসটির বিষয়বস্তুর মিল রয়েছে তবে উপন্যাসটির বর্ণনারীতি ভিন্নতর। 'খন্ড খন্ড ও ছোট ছোট চিত্রপটের মত ঘটনার রূপ পর পর সাজিয়ে কাহিনীটিকে সরলভাবে এবং অল্প কথায় পরিবেশন করা হয়েছে।'[২৯]

উপন্যাসটির একটি প্রধান চরিত্র অধীরের গবেষণার বিষয় 'এভরিম্যান ইজ বর্ন ইক্যোয়াল' প্রকৃতপক্ষে লেখকেরই বিশ্বাস। তাঁর এই বিশ্বাসই কাহিনীটির কেন্দ্রীয় সত্য। মাত্র ১১২ পাতার এই উপন্যাসে মোটামুটিভাবে ছয়টি চরিত্র কাহিনীটিকে পরিণতি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে, উপকাহিনী প্রায় নেই বললেই চলে। সম্ভবত জাত-পাতের বিচার যে অর্থহীন এই স্বাভাবিক সত্যটিকে প্রতিষ্ঠার জন্য কোন উপকাহিনীর সাহায্যের প্রয়োজন হয় নি। কোথাও পাঠকে রুদ্ধশ্বাসে উৎকন্ঠিত হতে হয়নি। উপন্যাসটির 'সুজতা' নামকরণের পেছনেও বিষয়বস্তুর আভাস নিহিত রয়েছে।

> বৌদ্ধ কাহিনীর যে সুজাতা নিজের সাধনার জোরে তার জন্মগত সমস্ত হীনতাকে জয় করে বুদ্ধদেবের কৃপালাভে ধন্য হয়েছিল এই উপন্যাসেও সমসাময়িক প্রেক্ষিতে সেইরকম এক চরিত্রের উপস্থাপনা করা আছে।[৩০]

চরিত্রটির নাম অম্বালিকা, ডাকনাম অম্বি। শৈশবে প্রায় বছরখানেক বয়সেই বাপ-মা হারিয়ে অন্ত্যজ এই শিশু উপেনবাবু এবং চারুবালার সংসারে আশ্রয় পায় 'মেয়ের মত' হয়ে।

উপেন রেলের পদস্থ কর্মী, একজন ইঞ্জিনিয়ার। স্ত্রী চারু। তাদের বিয়ের দশ বছর বাদে সন্তান রমা এসেছে সংসারে নতুন আনন্দ নিয়ে। রমার প্রথম জন্মদিনেই এই অন্ত্যজ সন্তানের আবির্ভাব। মেয়েটির মা-বাবা কলেরায় মারা যাওয়ায়, চৌকিদার ছেঁড়া কম্বলে জড়িয়ে ঘুমন্ত শিশুটিকে উপেনের বাংলোয় এনে হাজির করেছে ঠিক রমার জন্মদিনেই, শিশুটির কিছু একটা ব্যবস্থা করার জন্য। জন্মদিনে আমন্ত্রিত অভ্যাগতরা, অধিকাংশই একটি 'বাচ্চা' পাওয়া গেছে শুনে আগ্রহে এগিয়ে এসে জানতে চেয়েছে – লেপার্ডের বাচ্চা, না হরিণের না ভালুকের। পিতৃ-মাতৃহীন বাচ্চাটি মানুষের জানতে পেরেই তারা হতাশ এবং নিরুৎসাহ হয়েছে। 'মানুষের বাচ্চা ! হতাশ হয়ে আর যেন ক্ষুদ্র একটি তুচ্ছতার ধিক্কার ধ্বনিত করে বসে পড়েন চক্রবর্তী।'[৩১]

উপেন কোন সিদ্ধান্ত নিতে না পেরে আমতা আমতা করতে থাকায় চারু বলে ওঠে 'শেয়ালে নিয়ে যাবে মেয়েটাকে?' আয়াকে ডেকে চারু ও উপেন কয়েকটি দিনের জন্য শিশুটিকে 'পুষতে' বলে। কদিনের মধ্যে নতুন বাচ্চাটিকে গ্রহণ করার মত নীচুজাতের ইচ্ছুক কোনও দম্পতির খোঁজ মেলেনি। ইতিমধ্যে মেয়েটিকে আদোর করে 'অম্বি' বলে ডাক-খোঁজ শুরু হয়। দিন পেরিয়ে যায়। অম্বি একটু করে বড় হয়। একটু একটু করে তার প্রতি মায়া-মমতা বাড়তে থাকে উপেন ও চারুর। তবে মানুষের মনের দুর্বলতা সম্পর্কে তারা যথেষ্ট সচেতন। তাই মন যত নরম হয়, ততই চারু ও উপেন সতর্ক হয় যাতে অম্বি কোনভবেই রমার মত নিজেদের মেয়ে হয়ে না যায়। তাই সচেতন এই দম্পতি তাদের হৃদয় উৎসারিত স্নেহ-ভালবাসারও এক সীমা নির্ধারণ করে নেয়। অম্বিকে তারা খুব বেশি হলে 'মেয়ের মত' মনে করতে পারে কিন্তু কখনই রমার সঙ্গে একাসনে বসতে দেওয়া হবে না, নিজেদের মেয়ে ভাবা হবে না। শৈশব থেকে রমার সঙ্গে একই বাড়িতে বেড়ে উঠলেও, অম্বি তাই কখনো রমা হয়ে উঠতে পারে নি।

> একটি ঘরে চারুর বুকের কাছে ঘুমন্ত রমা, পীযূষভারে কোমল একটি উত্তাপের নীড়ের মধ্যে সুখসুপ্ত হয়ে রয়েছে একটি শিশু মেয়ে। আর অন্য একটি ঘরে আর একটি শিশু মেয়ে, নতুন বিছানায় একা একা ঘুমোয়, তার তৃষ্ণার্ত অধরের কাছে দুধের বোতল শিথিলভাবে পড়ে রয়েছে।[৩২]

ক্রমশ অম্বির প্রতি তাদের মায়া মমতা বেড়েছে, নীচুজাতের মেয়েকে ছুঁয়ে আদর করাও শুরু হয়েছে, কিন্তু তবু উপেন ও চারু সব সময়ই সতর্ক থাকে যাতে কিছুতেই 'মেয়ের মত' অম্বি, মেয়ে না হয়ে যায়। ইতিমধ্যে অনেক খোঁজ খবর করে অম্বিকে নিয়ে যাবার জন্য অম্বির জাতের লোকের খোঁজ পাওয়া গেছে। কিন্তু উপেন ও চারু অম্বিকে তার হাতে তুলে দিতে পারেনি। জানালা দিয়ে লোকটিকে দেখে মুচড়ে উঠেছে উপেনের অন্তর, অথচ তা প্রকাশ করে চারুর কাছে নিজের দুর্বলতা প্রমাণ করতে চায় না সে। চারুর মনের অবস্থাও ঠিক তাই উপেনের কাছ থেকে সামান্য ইঙ্গিত পেলেই আগন্তুকটিকে বিদায় করবে সে। চারুর মুখের দিকে তাকিয়ে উপেন বলে —

> ...খুব কম টাকাই তো দাবি করেছে, কিন্তু লোকগুলি ভাল কি মন্দ বুঝতে পারছি না। চারু হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে ...ঝাঁটা মার ...দূর দূর দূর! সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতর থেকে মারমূর্তি হয়ে বের হয়ে আসে উপেন...ভাগো ভাগো ভাগো। আগে নিজেরা মানুষ হও, তারপর পরের মেয়েকে মানুষ করতে এসো। যত সব ইডিয়ট হামবাগ্!'[৩৩]

এর পরেও অম্বিকে দার্জিলিং-এর অরফ্যানেজে পাঠানোর চেষ্টা হয়েছে। মেয়েটা ভাল থাকবে, পরিবারের সমস্যাটিও মিটবে এই আশায়। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। ট্যাক্সিতে চারুকে দেখতে না পেয়ে ছুটে এসে চারুকে জড়িয়ে ধরে অম্বি। হার মেনে অন্তরে খুশি হয় চারু। কিন্তু উপেন ও চারুকে নিজের মা, বাবা ভেবে নিষ্পাপ শিশুটির প্রতিদিনকার সহজ সরল দাবীগুলো ছোট সংসারটির সমস্যাটিকে ক্রমশ জটিলতর করে তোলে।

অম্বিকে লালন পালন করতে যত্নের কোন ত্রুটি করেনি উপেন ও চারু। তবে এই পালিত কন্যার প্রতি মায়া-মমতার বাহ্যিক প্রকাশে তারা ছিল অতি সতর্ক। এর ফলে রমা ও অম্বির মধ্যে কতগুলো মৌলিক পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রমা চারু ও উপেনকে স্বাভাবিকভাবেই মা ও বাবা বলে ডাকে কিন্তু অম্বির কাছে তারা আম্মি ও আপ্পি। রমা ঘুমোয় মার পাশে, অম্বি ঘুমোয় তার আলাদা ঘরে, আয়ার তত্ত্বাবধানে।

মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই অম্বিকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে সে এই বাড়ির মেয়ে নয়, তবে 'মেয়ের মত'। এ কথা না জানিয়েও উপায় ছিল না। কারণ অম্বি প্রতিটি ক্ষেত্রেই রমার সমান অধিকার দাবী করছিল এবং সেই দাবী আদায় করে ছাড়ছিল। তবে 'মেয়ের মত' শব্দ দুটি শোনার পর তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বুঝতে না পেরেও অম্বি, রমার সঙ্গে তার পার্থক্যটা মেনে নিতে শুরু করে। রমাকে পড়াতে গৃহ শিক্ষক এসেছে, গানের মাষ্টার এসেছে, অম্বি দূরে দাঁড়িয়ে দেখেছে। রমা কলেজে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বাইরে ছোটাছুটি করে, আর অম্বি মন দেয় ঘরের কাজে। আপ্পি ও আম্মির সুখ-সুবিধার জন্য সে থাকে সদা-সতর্ক। অম্বির এই তদারকিতে অনেকটাই নির্ভর হয়ে পড়ে উপেন।

রমা তার সরল মনে বরাবরই অম্বিকে নিজের ভেবে এসেছে। হিংসে করেছে, ঝগড়া করেছে আবার ভালোও বেসেছে। সংসার অভিজ্ঞ উপেন আর চারুর মেয়ে আর 'মেয়ের মতো'র মধ্যে ব্যবধান ও সেই ব্যবধানের কারণ বুঝতে রমা তার মা-বাবাকে এই কঠিন প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। প্রশ্নবাণে জর্জরিত উপনে আর চারু কিছুতেই রমাকে অম্বির সঙ্গে তার পার্থক্যের কারণটি স্পষ্ট করে বোঝাতে পারেনি। বিষয়টি অদ্ভুত ঠেকেছে রমার কাছে 'শেষ পর্যন্ত দাঁড়চ্ছে, ও হলো আমার বোন, তুমি হলে ওর মা, কিন্তু ও হলো তোমার মেয়ের মতো। অদ্ভুত।'

শিক্ষিত এবং হৃদয়ধর্মসম্পন্ন এই পরিবারটি অন্ত্যজ অম্বিকে সযত্নে পালন করেছে ঠিকই, কিন্তু কখনো সম্পূর্ণভাবে জাত-পাতের উর্দ্ধে উঠতে পারেনি। নিজেদের অন্তর উৎসারিত স্নেহ-মায়া-মমতাকে নিজেদেরই অন্তরের জাতিবৈষম্যের কুসংস্কার কখনো সচেতন, কখনো বা অবচেতন মনে পূর্বাপর শাসন করে গেছে। অম্বির প্রতি আচরণ যখন নিজেদের কাছেই অশোভন মনে হয়েছে, তখন নিজেরাই তাদের মনোমত যুক্তি দাঁড় করিয়ে নিজেদের অপরাধ আড়াল করতে চেয়েছে। চারু বলেছে – 'আমি ভালোর জন্যই চেয়েছি, অম্বি যেন নিজেকে রমার সমান মনে না করে বসে।'

অম্বিকে নিয়ে এই মধ্যবিত্ত পরিবারটির সমস্যা চরমে ওঠে রমা ও অম্বিকে পাত্রস্থ করার চেষ্টার মধ্য দিয়ে। উপেন ও চারু অম্বিকে গ্রহণ করার প্রথম দিনেই তার ওপর নীচু জাতের যে তক্‌মাটি এঁটে দিয়েছিল, উপন্যাসের শেষ পর্বে সেই তক্‌মার অগ্রাহ্য এবং লোপাট হয়ে যাওয়াটা, এই শিক্ষিত দম্পতির কাছে অসনীয় হয়ে উঠেছিল। চারু এই পরিণামে চিৎকার করে ওঠে – 'মেয়ের মত নয়, সাপের মত।' ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে উপেন – 'আর দেরী করা উচিত নয়। অম্বিকে জানিয়ে দাও, জিজ্ঞাসা করে নাও, তারপর নি:শব্দে বিদায় করে দাও।'

ঘটনাটিতে অন্তত আরো একটি বিষয় পরিষ্কার হয় যে, শুধুমাত্র নীচু জাতের মেয়ে হওয়ার জন্যই যে রমার সঙ্গে অম্বির একটা বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছিল, তা ঠিক নয়। নিজেদের সন্তান রমার প্রতি উপেন ও চারুর মমত্ব ছিল অম্বির তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি। তাদের মমত্বের এই পক্ষপাতিত্ব কখনই রমা ও অম্বিকে একাসনে বসতে দেয়নি। আরো স্পষ্টভাবে বলা যায় অম্বির প্রতি তাদের স্নেহ ও মায়ার অনেকটাই ছিল করুণানির্ভর।

উপন্যাসটির মধ্যে অধীর চরিত্রে অনেক বেশি গুণের সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে। অধীর উপেনের দূর সম্পর্কের পিসিমার নাতি। অধীরই সংসারে পিসিমার একমাত্র স্নেহের বাঁধন। কিন্তু পিসিমা এবং অধীরের চিন্তা ভাবনা ও আদর্শে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। জাত-পাতের বিচারে পিসিমা শুধুমাত্র রক্ষণশীল নন অত্যন্ত কট্টর মনোভাবাপন্ন। তাই চিঠিতে তিনি উপেনকে স্মরণ করিয়ে দেন যে উপেন খুবই উঁচু বংশের সন্তান। উপেনদের সাত-পুরুষে কেউ কুলীন ছাড়া কোন নীচু ঘরে কুটুম্বিতা করেনি। অম্বি সম্পর্কে তাঁর মত আরো কঠোর। — 'ভাবিয়া পাই না, তুমি কি করিয়া তোমার জাতের উচ্চতা ও

শুচিতা ভুলিয়া একটি অন্ত্যজের মেয়েকে ঘরে স্থান দিতে পার। আশা করি, পত্রপাঠ উহাকে বিদায় করিয়া দিবে।' অন্যদিকে অধীর এক সংস্কারমুক্ত শিক্ষিত যুবক। অধীর তার গবেষণায় প্রমাণ করতে চায় যে —

> জন্মগত কোন সংস্কার বলেও কিছু নেই। হেরিডিটি একটা ভূয়া থিওরি। কাস্ট একটা অতি মিথ্যা, ব্লাড কোন সংস্কারেরই ধারক নয়।...রক্তের বন্ধন নাড়ির টান-এসবই ভূয়ো।[৩৪]

পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনে উপেন তার মেয়ে রমার বিয়ে দিতে চায় জানতে পেরে পিসিমা রমার সঙ্গে অধীরের বিয়ে দেবার জন্য অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে ওঠে। বিয়ে করতে আপত্তি থাকা সত্ত্বেও পিসিমার একান্ত আগ্রহে অধীর উপেনের বাড়ি যায় প্রাথমিক পরিচয় করার জন্য। সেখানে গিয়ে প্রথম দর্শনেই রমার পরিবর্তে আটপৌরে এবং শান্ত অম্বিকে, ভাল লাগে অধীরের। অম্বি এতদিনে বুঝে গেছে যে সে ঐ বাড়ির মেয়ে নয়, 'মেয়ের মত'। তাই স্বাভাবিক কুন্ঠার বশেই অধীরের ভালবাসা সে গ্রহণ করতে পারেনি।

অম্বি জেনেছে সে নীচু জাতের মেয়ে। আর তাই তার অন্তরের ইচ্ছাকে দমিয়ে রেখে অধীরের প্রেমকে দূরে সরিয়ে রাখতে সচেষ্ট হয়েছে বারবার। কিন্তু তাতে তার প্রতি অধীরের আকর্ষণ বিন্দুমাত্র কমে নি। নির্মম আঘাতে অধীরের অন্তরকে চূর্ণ করে দিতে অম্বি তার আত্মপরিচয় প্রকাশ করে।

> আমি ভয়ানক ছোট জাত। আমি অন্ত্যজা, অস্পৃশ্যা আমার রক্তে দোষ আছে। আপনাদের পবিত্র পৃথিবীতে আমি একটা আবর্জনা।[৩৫]

অম্বি ভেবেছিল এই পরিচয় পেয়ে, অধীর ঘৃণায় তাকে ত্যাগ করবে, মোহমুক্ত হয়ে সরে যাবে তার জীবন থেকে। কিন্তু সেই ঘৃনার পরিবর্তে অধীরের মুগ্ধ চোখে ফুটে ওঠে এক পরম প্রাপ্তির বিস্ময়। তৃপ্ত অধীর বলে —

> তুমি আমার জীবনের সব অন্বেষণের জয়গান গাইছ। সত্য বলে বুঝতে চেয়েছিলাম যে কথাকে, তুমি তারই রূপ, তারই প্রমাণ। তুমিই আমার বিশ্বাস, আর থিওরীর শেষ অধ্যায় আজ আমি লিখবো। ...তুমি ভুল ভাঙানো এক সুন্দর সত্যের মূর্তি। জাত মিথ্যা, রক্ত মিথ্যা – তোমার মধ্যেই তার প্রমাণ পেলাম।[৩৬]

কিন্তু আপ্পি এবং আম্মির প্রতি অম্বির কর্তব্য ও কৃতজ্ঞতাবোধ তাকে অধীরের প্রেমের কাছে আত্মসমর্পণে পিছিয়ে যেতে বাধ্য করেছে যখন জানতে পেরেছে যে তার আপ্পি এবং আম্মি রমাকে পাত্রস্থ করার জন্যই অধীরকে এ বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। অম্বি তাই খুব সহজেই অধীরকে লিখেছে — 'আমাকে যদি সুখী করতে চাও, তবে রমাকে বিয়ে কর।'

এর আগে অম্বি বারবার এড়িয়ে গেছে অধীরকে। অনেকভাবে চেষ্টা করেছে রমা এবং অধীরের মধ্যে একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলতে। কিন্তু বিফল হয়েছে প্রতিবার। শেষে রমাকে বিয়ে করবার জন্য অম্বির একান্ত অনুরোধের এই চিঠিটি পাওয়ায়, অধীর স্পষ্ট বুঝতে পারে কেন অম্বি তার কাছে থেকে দূরে সরে গিয়েছে বারবার। অন্ত্যজ একটি মেয়ের কঠিন আত্মত্যাগের এ ইচ্ছা, অম্বিকে অধীরের কাছে আরো মহিমান্বিত করে তুলেছে। ফলে ত্বরান্বিত হয়েছে অধীরের প্রতিক্রিয়া। যে পিসিমা নীচু জাতের মানুষকে ঘণা করে এসেছে আজীবন, সেই পিসিমাকে রাজি করিয়েছে অম্বিকে নাত-বৌ করার জন্য উপেনের বাড়ীতে প্রস্তাব নিয়ে যেতে।

পিসিমার কাছে এ ধরণের প্রস্তাব পেয়ে হতবাক হয়েছে উপেন ও চারু। রমার জন্য নির্বাচিত পাত্রকে কিভাবে বাগিয়ে নিয়েছে অন্ত্যজ, নীচুজাতের, প্রথাগত শিক্ষাহীন অম্বি, তা তারা ভেবে পায় না কিছুতেই। এ জন্য তারা একান্তভাবেই দায়ী করে অম্বিকে। নীচু জাতের নীচু মন ও হিংসাকে।

উত্তেজনায় চলতে গিয়ে সিঁড়ি থেকে পড়ে যায় চারু। 'বি-টাইপ' রক্তের প্রয়োজন হয়। উপস্থিত কারো রক্তের নমুনা মেলে না, মেলে অম্বির রক্তের সঙ্গেই। অম্বির রক্তেই সেরে ওঠে চারু। এই ঘটনাটাও সহজভাবে নিতে পারেনি উপেন অথবা চারু। উপেন বলে – 'আবার একটা অপমান সইতে হলো চারু'। সদ্য সুস্থ হয়ে ওঠা চারুর আক্ষেপ – 'দয়া করে আমাকে বাঁচিয়েছে অম্বি, ওর ওপর রাগ করবার অধিকারও রইল না।'

অপরাধবোধে জর্জরিত অম্বি অধীরকে জানায় যে তার নি:শ্বাসে বিষ আছে এবং বেঁচে থাকাটাই তার সবচেয়ে বড় অপরাধ। অম্বি স্পষ্ট করে জানায় যে সে বিয়ে করবে না। অধীর অম্বির চিঠিটা 'দুমড়ে, মুচড়ে' অম্বির বিছানার উপর ফেলে নীরবে চলে যায়। অম্বি তন্দ্রাচ্ছন্ন কণ্ঠে অধীরের অনুপস্থিতিতেই বলতে থাকে — 'তুমি সুখী হবে, রমাকে বিয়ে কর। আমার কথা রাখ'। হঠাৎই ঘরে ঢুকে এ কথা শুনতে পায় উপেন। বিছানায় পড়ে থাকা চিঠিটি পড়ে চেঁচিয়ে ওঠে উপেন – 'হেরেছি চারু, সত্যিই হেরে গিয়েছি।' চারু ও উপেন সত্যিই হেরে যায়। অম্বি আর 'মেয়ের মত' নয়। উপেন বলে – 'আরে তুই যে আমাদেরই মেয়ে।' মুক্ত মনে উপেন ও চারু অধীরের সঙ্গে অম্বির বিয়ে দিতে উদ্যোগী হয়।

আজীবন জাত-পাতের সংস্কারে অখন্ড বিশ্বাসী পিসিমা শুধুমাত্র অম্বির সঙ্গে অধীরের বিয়েতেই সম্মতি দেন নি, তিনি তার সমস্ত সম্পত্তিও অম্বিকে দান করেন। তার কথায় –'যখন হার মেনেছি, তখন ভাল করেই হেরে যেতে চাই।'

এই উপন্যাসে আমরা দেখি তিনটি প্রজন্মের নারী পুরুষ – পিসিমা, উপেন-চারু, অধীর-রমা এরা শুরুতে জাতিভেদের বিরুদ্ধে এক মহৎ চেতনায় উন্নীত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় লক্ষ্য করার মত যে জাত-পাতের ভেদাভেদ, অস্পৃশ্যতার অভিশাপ থেকে দেশের মানুষ ক্রমশ মুক্ত হতে শুরু করেছে। লেখকের এই আশার বাণীর পক্ষে প্রমাণ হিসেবে আমরা দেখি পিসিমা জাতিভেদের বিষয়ে যতটা কট্টর, পরবর্তী প্রজন্ম, উপেন ও চারু ততটা কট্টর নয়। তাই 'মেয়ের মতো' করে হলেও অন্ত্যজ অম্বিকে পরিবারে স্থান দিয়েছে এবং পরবর্তী প্রজন্ম অধীর ও রমা এই জাত-পাতকে বলিষ্ঠ কণ্ঠে অস্বীকার করেছে। শুধু তাই নয়, পিসিমাকেও আধুনিক উদার ভাবধারায় বিশ্বাসী করে তুলেছে। নতুন প্রজন্মের এই উদার ভাবনার মধ্য দিয়েই সুবোধ ঘোষ এক কুসংস্কারমুক্ত উন্নত ভারতের স্বপ্ন দেখেছেন এ উপন্যাসে।

'শ্রেয়সী' উপন্যাসে সুবোধ ঘোষ এক বিপন্ন অস্তিত্ব জমিদারবাড়ির প্রেক্ষাপটে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে পারস্পরিক সম্মান, বিশ্বাস এবং কর্তব্যবোধ নর-নারীর দাম্পত্য প্রেমের প্রাথমিক শর্ত।

রসিকপুরের জমিদারবাড়ি তার সব বৈভব হারিয়ে, জরাজীর্ণ ভগ্নদশায় তার অস্তিত্বের প্রমাণ দিচ্ছে। ৬৫ বছরের বৃদ্ধ কমল বিশ্বাস এবং তার স্ত্রী সুধাময়ী এই পতনোন্মুখ জমিদারবাড়ির শেষ প্রতিনিধি। তাদের দুজনের স্বাস্থ্য জমিদারবাড়ির অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তাদের ছেলে অতীন এবং মেয়ে বাসনা দুজনেরই বিয়ের বয়স হয়েছে। দীর্ঘ জীবন ধরে লোক ঠকিয়ে কখনো বা সাত পুরুষের জমিদারীর এটা সেটা বিক্রী করে, আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে সংসার এবং ছেলের লেখাপড়া চালিয়ে এসে, মেয়ের বিয়ের ভাবনায় খুবই অস্বস্তিতে পড়েছে কমল বিশ্বাস। ঠাকুর দালানে রাতের অন্ধকারে জেগে বসে

মেয়েকে ঠাট্-বাট্ বজায় রেখে বিয়ে দেবার ফন্দি-ফিকির খোঁজে সে।

শিক্ষিত অতীন এই ভাঙা জমিদারবাড়ির প্রাণহীন পরিবেশ থেকে মুক্তি পাবার জন্য এক রাতে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করার সময় রাতজাগা কমল তাকে এই পরিবারে পুরুষানুক্রমে চলে আসা একটি গল্প শোনায়। কমল বলে যে সে তার ঠাকুমার কাছে জেনেছে এই ঠাকুরদালানের একটি থামে পাঁচ কলস সোনা লুকোনো আছে। সাত পুরুষ এই সম্পত্তি ভোগ করতে পারবে না, এবং অতীন অষ্টম পুরুষ। এ কথা শোনার পর অতীনের ভাবনা-চিন্তা ওলোট-পালোট হয়ে যায় এবং পালিয়ে যাবার কথা ভুলে শোবার ঘরে গিয়ে ঢোকে।

ইতিমধ্যে বাসনার বিয়ের একটা উপায় বের করে ফেলেছে কমল বিশ্বাস। ধনকুবের রামকানাইবাবুর কুরূপা ভগ্নী কেতকীর সঙ্গে মোটা বরপণ ও গহনার বিনিময়ে ছেলে অতীনের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করেন। এবং ছেলের বিয়েতে পাওয়া ঐ টাকা ও গহনায় বিয়ে দেন বাসনাকে প্রফেসর ছেলে অজিতের সঙ্গে। মেয়ের বিয়েতে কুটুম্বদের সামনে এক হাজার কাঙালী ভোজন করিয়ে রসিকপুরের জমিদারবাড়ির অভিজাত্য বজায় রাখলেন কমল বিশ্বাস।

কাহিনীটির পর্বে পর্বে আমরা দেখি অতীনের কুরূপা স্ত্রী কেতকী তার ব্যবহারে আচরণে কর্তব্যবোধে কমল ও সুধাময়ীর স্নেহ ও মমত্ব আদায় করে নিয়েছে। তার শিক্ষা, আত্মমর্যাদাবোধে রুচি এবং বিশেষত শ্বশুর-শাশুড়ির প্রতি যথার্থ কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে 'শ্রেয়সী' হয়ে উঠেছে। অতীন একদিনের জন্যও কেতকীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারে নি। ফুলশয্যার বিছানা দেখে ঘেন্না হয়েছে সুদর্শন যুবক অতীনের।

> বিছানা তো নয়, যেন একটা অদৃশ্য হাঁড়িকাঠ ওখানে লুকিয়ে রয়েছে। ভয়ানক কুৎসিত একটা স্পর্শের কাছে অতীনের এই সুন্দর শরীরটাকে বলি দেবার জন্য একটা চক্রান্ত ঐ ফুলের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে। দেখতে ঘৃণা বোধ করে অতীন।[৩৭]

উপন্যাসটিতে ঘটনার ঘনঘটা আছে। মূল কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বেশ কয়েকটি উপকাহিনী, আমদানি হয়েছে অনেক চরিত্রের। উপকাহিনীগুলো অনেক ক্ষেত্রেই তাদের স্বল্প পরিসরের জন্য পাঠককে তৃপ্ত করতে পারেনি। বেশ কয়টি চরিত্র রঙ্গমঞ্চে হঠাৎ উপস্থিত হয়ে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেই বিদায় নিয়েছে। তবুও এই ঘটনাগুলোকে একসূত্রে গেঁথে লেখক মূল কাহিনীটিকে পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে পূর্বাপর সচেষ্ট থেকেছেন।

অতীনের জীবনে তিনটি চরিত্রের প্রভাব রয়েছে। বিবাহিতা স্ত্রী কেতকীকে সে পূর্বাপর ঘৃণা করেছে, যখন সম্বিত ফিরে পেয়েছে, তখন কেতকী অন্য পুরুষকে ভালবেসে বিয়ে করেছে, সঙ্গে নিয়ে গেছে অতীনের পুত্র সন্তানকে। অতীন বিবাহিত জীবনে কেতকীকে স্বীকৃতি না দিলেও, তার পৌরুষকে অবজ্ঞা করার জন্য হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে বর্বরোচিতভাবে কেতকীর সঙ্গে মিলিত হয়ে সদম্ভে গৃহত্যাগ করেছে। তার ইচ্ছানুসারে কেতকী নির্দ্বিধায় বিবাহ বিচ্ছেদের কাগজেও স্বাক্ষর করেছে।

প্রকৃতপক্ষে বিয়ের পূর্বেই অতীন আসক্ত ছিল অপরূপা সুন্দরী কাজরীর প্রতি। যদিও কাজরীর প্রতি ভালবাসায় অতীনের কোন ঘাটতি ছিল না তবুও অতীন-কাজরীর ভালবাসা দাম্পত্য জীবনের সার্থকতা লাভ করতে পারে নি। কারণ তাদের বিয়ের পর স্পষ্ট হয় যে কাজরী অতীনকে কখনো একজন পুরুষ শয্যাসঙ্গীর বেশি মর্যাদা দিতে পারে নি। অতীনের সুন্দর চেহারা এবং সুঠাম দেহের মূল্যটুকুই দিয়েছে কাজরী, তার জীবনের প্রকৃত সঙ্গী করে নিতে পারে নি। কারণ, কাজরীর রূপগুণের অন্যান্য স্তাবকেরা, অসিত, জীমূত, গাঙ্গুলীরা অতীনের তুলনায় অনেক বেশি বিত্তবান, অনেক বেশি প্রাণবন্ত, অনেক বেশি

আধুনিক এবং সংস্কার বর্জিত। রূপসী কাজরীর কদর্য অন্তর অতীনের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন তার গর্ভস্থ সন্তানকে আবর্জনা জ্ঞান করে একতরফাভাবে গর্ভপাতের সিদ্ধান্ত নেয়। কাজরীকে তার সন্তানের মা হওয়ার অনুরোধ জানিয়ে অপমানিত হয় অতীন —

> তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, তাই নিজের জীবনের অনন্দটাকেও আনসেফ করে দিতে তোমার ইচ্ছে হয়েছে। কিন্তু তোমার পাগলামির জন্য আমি তো একটা আবর্জনা পুষে রাখতে পারি না।[৩৮]

দুজনের সম্পর্কের ফাটলটা বড় হয়। মানসিক অবসাদে ক্লান্ত অতীন কাজরীকে জৈবিক সুখে আর তৃপ্ত করতে পারে না, একে অন্যকে ঘৃণা করতে শুরু করে। অতীন নি:সঙ্গ হয়, কাজরী তার স্তাবক পরিবৃত হয়ে খুশির তুফানে যোগ দেয়।

অতীনের এই নি:সঙ্গ জীবনে এসেছে ডাক্তার বিজয়া। বিজয়ার সঙ্গে অতীনের এই ঘনিষ্টতা যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য হয়নি। বরাবর পুরুষ বিদ্বেষী বিজয়ার অতীনের কাছে আসার পেছনে যে একটি গ্রহনযোগ্য কারণ রয়েছে, তা হলো – বিজয়া অতীনের মতামত না নিয়েই কাজরীর গর্ভপাত করানোর জন্য একটা অপরাধবোধে অতীনকে বিয়ে করে, তার সন্তানের মা হয়ে, অতীনের ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করেছে। কিন্তু কেতকীকে ত্যাগ করে কাজরীর দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে অতীনের বিজয়ার আহ্বনে সাড়া দেওয়ার পেছনে বাস্তবসম্মত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে অতীন-বিজয়াকে রসিকপুরের জমিদারবাড়িতে পাঠিয়ে বৃদ্ধ কমল বিশ্বাস ও সুধাময়ীকে সংসারে নতুন করে বেঁচে থাকার উপায় করে দিয়েছেন লেখক।

প্রাথমিকভাবে কাহিনীটি একটি পতনোন্মুখ জমিদারতন্ত্রের পটভূমিতে রচিত হলেও সামন্ততান্ত্রিক ভাঙনের কথা, আর্থসামাজিক পরিবর্তনের কথা এই উপন্যাসে বিশেষ নেই। শ্রেণী সংগ্রামের কথার পরিবর্তে, একটি বিশেষ পরিবারের কথা, বিশেষত কেতকীর ব্যক্তিগত লড়াইয়ের কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। তবে শ্রেয়সী প্রধানত কেতকীর উপাখ্যান হলেও উপন্যাসটিতে মধ্যবিত্ত মানসিকতার বাস্তব প্রতিফলনও রয়েছে। সুবোধ ঘোষের অন্যান্য উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্রের মত শ্রেয়সীর বেশিরভাগ চরিত্রও একমাত্রিক বা সরলরৈখিক। এ প্রসঙ্গে অরিন্দম গোস্বামী লিখেছেন —

> উপন্যাসের চরিত্র চিত্রণেও সর্বত্র বিশ্লেষণ বা দ্বান্দ্বিকতা পরিলক্ষিত হয় না। চরিত্র বিকাশও সর্বত্র ধারাবাহিক নয়। চরিত্রের বিবর্তনও যা হয়েছে তার সবই সরলরৈখিক পথে।[৩৯]

এই উপন্যাসে অন্য একটি বিষয়ও লক্ষ্য করার মত। বেশ কয়েকটি চরিত্র বিবর্তনের পর তাদের পূর্ববর্তী বিশ্বাস থেকে সরে গিয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত এক একটি বিশ্বাসে আস্থা স্থাপন করেছে। প্রথমত ধরা যাক কমল বিশ্বাসের কথা। প্রথমে কেতকীকে যে দৃষ্টিতে কমল বিশ্বাস দেখেছে, পরবর্তীতে সে দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। কেতকীকে কমল বিশ্বাস এবং তার স্ত্রী সুধাময়ী নিজের মেয়ের মত ভালবেসেছে। অতীন কাজরীকে প্রথমে ভালবেসে পরে ঘৃণা করেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় ডাক্তার বিজয়ার ক্ষেত্রেও। লেখক কমল বিশ্বাস এবং অতীনের বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের জন্য যথোপযুক্ত ঘটনা বিন্যাস ঘটালেও ডাক্তার বিজয়ার ক্ষেত্রে তা করে নি। – একান্ত পুরুষ বিদ্বেষী বিজয়া, যে কোন পুরুষ শিশু সন্তানকেও স্পর্শ করতে ঘৃণা করে সে অতি সহজেই, নিজ আগ্রহ প্রকাশ করে এক রকম জোর করেই কিভাবে অতীনকে বিয়ে করল তার গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা এই কাহিনীতে নেই।

এই উপন্যাসে অন্য একটি লক্ষ্য করার মত বিষয় হলো, সুবোধ ঘোষ ব্যবহারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণেরও চেষ্টা করেছেন। দাম্পত্য কলহের সময় কাজরী অতীনের কাছে

জানতে চেয়েছে 'স্ত্রী কাকে বলে, সেটা 'জান কি ?' উত্তরে অতীন বলেছে – 'আমার ছেলেকে ভালবেসে বাঁচিয়ে রাখবে 'যে মেয়ে।' অন্যদিকে নির্মলের বুকে মাথা রেখে কেতকী স্বামীর সংজ্ঞা নির্ধারণ করে বলেছে – 'আমার ছেলেকে ভালবেসে বাঁচিয়ে রাখবে যে, সে-ই তো আমার স্বামী'।

কাহিনীর চরিত্রের মুখ দিয়ে কথাগুলো বলানো হলেও, সুবোধ ঘোষ উপন্যাসে এই সত্যই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে অপত্য সন্তান স্নেহের মধ্যে দিয়েই দাম্পত্য জীবনে স্বামী ও স্ত্রী তাদের সমস্ত মত এবং আদর্শগত পার্থক্যের উর্দ্ধে উঠে এক সুস্থ এবং স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে। সুবোধ ঘোষের স্বামী ও স্ত্রীর এই সংজ্ঞা সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন —

> এই সংজ্ঞার সার্বভৌম প্রয়োগের যৌক্তিকতা যাহাই হউক, উপন্যাসবর্ণিত ঘটনা পরিবেশে উহার বিশেষ উপযোগিতা আছে।[৪০]

সুবোধ ঘোষের কথাসাহিত্যে বরাবরই মধ্যবিত্ত চরিত্ররা ভিড় করেছে। মধ্যবিত্ত চরিত্রের কঠোর সমালোচক এই লেখক তাঁর বিভিন্ন রচনায় মধ্যবিত্ত সমাজের অর্থহীন আভিজাত্যবোধের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। 'শুন বরনারী' উপন্যাসেও আমরা লেখকের সেই একই প্রচেষ্টা লক্ষ করি।

উপন্যাসটিতে দুটি প্রধান চরিত্র – একেবারেই নিম্নবিত্ত হিমাদ্রিশেখর এবং এক অভিজাত পরিবারের মেয়ে যুথিকা। যুথিকার বাবা চারু ঘোষ, তার বাড়ির নাম – উদাসীন। এই পরিবারের আদর্শ এবং বিশ্বাসের সঙ্গে বাড়ির নাম উদাসীন যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ। কারণ, চারু ঘোষেরা 'উদাসীন' এর বাইরের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক, শুধুমাত্র দেওয়া-নেওয়ার নিরিখেই বিচার করেন। বাইরের মানুষের কোন সুখ, দু:খের বিষয়ে তারা একান্তই নির্লিপ্ত। উপন্যাসটির কাহিনীতে লেখক দেখিয়েছেন কিভাবে এই অহঙ্কারী মানুষগুলো তাদের সমস্ত আভিজাত্যের বাধা ভেঙে ফেলে এক অস্বস্তিকর পরিবেশে নিম্নবিত্ত একটি পরিবারের দরজায় গিয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছেন।

হিমাদ্রিশেখর দত্ত এক আশ্চর্য আদর্শনিষ্ঠ এবং পরোপকারী চরিত্র। সে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করে বটে কিন্তু পসার নেই। তবুও এই বিদ্যার সুবাদেই সবার কাছে 'হোমিও হিমু' বলেই পরিচিত। পয়সার প্রয়োজনে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বাড়িতে গিয়ে পড়ায় আর সময়ে অসময়ে পরোপকার করে বেড়ায়। তবে বাইরে কাউকে নিয়ে যাওয়া, বা বাইরে থেকে কাউকে গিরিডিতে নিয়ে আসা সংক্রান্ত ছোটাছুটির কাজ জুটলে হিমু সদাপ্রস্তুত। পরেশবাবুর পিসিমাকে গঙ্গাস্নান করিয়ে আনা, কোলকাতা থেকে বিয়ের জিনিসপত্র নিয়ে আসা, অধিবাসের তত্ত্ব পৌঁছানো কাউকে অপারেশনের জন্য বাইরে নিয়ে যাওয়া নবলকিশোরবাবুর মেয়েকে শান্তিনিকেতন পৌঁছে দেওয়া এ সমস্ত দায়িত্ব খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে হিমু। সবাই খুবই বিশ্বাস করে এই পরোপকারী হিমুকে।

> হিমু মাস্টার বললে সকলেই বুঝতে পারে, ঐ সেই ছেলেটি, দেখতে মন্দ নয়, স্বভাবটি বড়ো শান্ত, বড়ো কর্মঠ আর কেমন একটু, অর্থাৎ ঠিক বোকা নয়, একটু বোকা বোকা। অর্থাৎ খুব বেশি ভালমানুষ হলে যা হয়, তাই।[৪১]

একদিন যূথিকাকে পাটনা পৌঁছে দেবার অনুরোধ এলো হিমুর কাছে। চারু ঘোষ বিনামূল্যে অন্যের উপকার গ্রহণে রাজী নন। অন্যদিকে স্বভাব পরোপকারী হিমু এ জন্য কোন পারিশ্রমিক নিতে সরাসরি অসম্মত হওয়ায় বাধ্য হয়েই চারু ঘোষকে তার অহঙ্কারবোধের সঙ্গে আপোস করতে হল। হিমুর নি:শর্ত পরোপকারের নেশা চারুবাবুর কাছে 'একটা ইডিয়টের অহঙ্কারের বাতিক' বলেই মনে হল। যূথিকার পাটনা যাত্রার কারণ, তার প্রেমিক নরেনের সঙ্গে দেখা করা। হিমুকে ইডিয়ট জেনেও যূথিকা তার সঙ্গে পাটনা যেতে রাজি হলো কারণ 'অন্তত নামে মাত্র একটা পুরুষ মানুষ সঙ্গে থাকলেও

চোরের উপদ্রব থেকে একটু নিরাপদ থাকা যায়।' প্রেমের তাগিদে যতবারই যূথিকা নরেনের সঙ্গে পাটনা যায় তার সঙ্গী থাকে 'নামে মাত্র একটা অস্তিত্ব' হিমু। ক্রমে যাত্রাসঙ্গী হিমুর সঙ্গে যূথিকার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। হিমুর ভব্য আচরণ এবং ব্যবহারে তার প্রতি যূথিকার মনোভাব দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে। যূথিকা একান্তে ভাবে,'ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ করবার ক্ষমতা সংসারের সবচেয়ে সাংঘাতিক নিন্দুকেরও নেই, বোধহয় এই গর্বেই মজে আছে হিমু দত্তের মন।' প্রথমে যূথিকার পাটনা ভ্রমণের উদ্দেশ্য নরেনের সঙ্গে দেখা করা হলেও পরে যূথিকার পাটনা ভ্রমণের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় হিমুর সান্নিধ্য লাভ করা। কারণ, এরই মধ্যে সে হিমুর প্রতি এক দুর্নিবার আকর্ষণ বোধ করতে শুরু করেছে। যূথিকার এই পরিবর্তন সম্পর্কে লেখক বলেছেন —

> যূথিকা ঘোষের জীবনের গন্তব্যটা পাটনা বটে; সেই পাটনাকে যে বেশ ভালো লাগে কিন্তু পাটনা যাবার ঝঞ্ঝাটও যে একটা উৎসবের আনন্দ হয়ে যূথিকা ঘোষের কল্পনায় দুলতে শুরু করে দিয়েছে।[৪২]

পুরুষের প্রতি একটি নারীর একান্ত অবহেলা ক্রমে ক্রমে বন্ধুত্ব, ঔৎসুক্য, ভাললাগা, পুরুষটির প্রতি তার অধিকার বোধের জন্ম এবং শেষে নি:শর্ত আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে কিভাবে যে এক পরিণত প্রেমের পর্যায়ে পৌঁছোতে পারে, সুবোধ ঘোষ যূথিকা চরিত্রের মধ্য দিয়ে তা নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। হিমুর প্রতি তার অধিকার বোধেই যূথিকা হিমুকে স্পষ্টভাবে বলেছে সে কিছুতেই যাতে লতিকাকে গিরিডিতে নিয়ে না যায়। 'তুমি ললিতাকে গিরিডিতে নিয়ে যাবে না, আমাকে স্পষ্ট করে কথা দাও।' নিজের সঙ্গে অনেক বোঝাপড়ার পর যূথিকা স্পষ্টভাবেই হিমুকে বলেছে — বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে মিথ্যা কথা বলছি না; আমি তোমাকে ভালবাসি। ...বিশ্বাস করো তোমার সঙ্গে বিয়ে না হলে সুখী হতে পারবো না।

যূথিকা অকপটে হিমুকে তার প্রেম নিবেদন করলেও তার অন্তরদ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি ঘটে নি। 'উদাসীন' এর পরিবেশে ফিরে গিয়ে, অফুরন্ত বৈভবের মাঝে দাঁড়িয়ে, চারিদিকে ছড়ানো সুখের উপকরণগুলোর দিকে তাকিয়ে পরক্ষণেই যূথিকার মনে হয়েছে হিমুর প্রতি প্রেম তার এক সাময়িক মানসিক বিভ্রান্তি।

প্রকৃতপক্ষে যূথিকার চরিত্র বিন্যাসের মধ্য দিয়েই এক সাধারণ পরোপকারী যুবক হিমুর চরিত্রের বলিষ্ঠ দিকগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। হিমু দরিদ্র কিন্তু আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, হিমুর হৃদয়ে ভাললাগা-ভালবাসা আছে কিন্তু তা কখনো বাস্তবকে অস্বীকার করেনি। তাই আমরা কাহিনীতে দেখি, যূথিকার একান্ত অনুরোধেও হিমু লতিকাকে গিরিডিতে পৌঁছে দেবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে নি। কারণ তখন পর্যন্ত যূথিকা এবং লতিকার মধ্যে কোন পার্থক্য তার কাছে ছিল না। শেষ ট্রেনযাত্রায় যূথিকার প্রেম নিবেদনে হিমু নিরুত্তর থাকলেও যূথিকা যখন প্রশ্ন করে 'তার মানে আমাকে নিয়ে পালিয়ে যাবার সাহস তোমার নেই' তখন হিমুর অর্থবহ উত্তর 'তোমাকে ভালবাসি বলে'। অর্থবহ বলবো এই জন্য যে হিমু তার বাস্তববুদ্ধিতে এটা বুঝতে পেরেছিল যে যূথিকার প্রেমের প্রকাশ নিছকই এক ভাবাকুল মুহূর্তের হঠকারী সিদ্ধান্ত। হিমুর 'তোমাকে ভালবাসি বলে' কথাটির পেছনে রয়েছে যূথিকার জন্য মঙ্গলাকাঙ্খা।

রক্ত মাংস গড়া সজীব একজন মানুষের মধ্যে শুধুই বিভিন্ন গুণের সমাবেশ থাকবে, কোনও দুর্বলতা থাকবে না এমনটি সচরাচর দেখা যায় না, অস্বাভাবিক এবং কৃত্রিম মনে হয়। হিমু চরিত্রের সামান্য একটু দুর্বলতা তাই চরিত্রটিকে অস্বাভাবিকতা দোষে দুষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করেছে। যখন ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে যূথিকা জানায় যে হিমুর প্রতি তার ভালবাসার কথা সে সরাসরি নরেনকে জানাতেও প্রস্তুত,

তখন হিমুর চোখে এক পরম প্রাপ্তির তৃপ্তি পাঠককে বুঝিয়ে দেয় হিমু শুধুমাত্র সদ্‌গুণের বিড়ম্বনা নয়, বরং এক সজীব চরিত্র। কারণ, এক নারীর মিথ্যা ভালবাসার কাতর আহ্বানে সর্বগুণসম্পন্ন, বাস্তববাদী হিমুর চোখেও স্বপ্ন জেগে উঠেছিল।

যূথিকার প্রেম নিবেদনের মুহূর্তে হিমুর অন্তরাত্মা যে সাময়িকভাবে হলেও উদ্বেল হয়ে উঠেছিল, তা স্পষ্ট হয় লেখকের বর্ণনায়। 'শুধু ওইটুকু জানবার সাধ যে হিমুর জীবনের চরম সাধ আর স্বপ্ন হয়ে হিমুর বুকের ভিতর জমা হয়েছিল, সে সত্য ধরা পড়িয়ে দিলো হিমুর চোখ দুটো।' এটুকু বিচ্যুতি একান্ত আদর্শনিষ্ঠ হিমু চরিত্রকে স্বাভাবিকত্ব দান করেছে।

কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়েছে হিমু। 'উদাসীন' এর পরিচিত ঘেরাটোপে ফিরে গিয়ে যূথিকা যখন নতুন করে উপলব্ধি করতে পেরেছে যে হিমাদ্রি কিছুতেই তার স্বামী হতে পারে না, তখন সে নিজেই ছুটে যায় এক অবর্জনাময় ঘিঞ্জি পরিবেশে হিমুর বাড়ীর দরজায়। অন্তরে তখন তার একটিই প্রার্থনা হিমু যাতে তার প্রেমের আহ্বানে সাড়া না দেয়। কারণ, নিজ আভিজাত্যে সচেতন যূথিকা এখন কিছুতেই চায় না যে হিমু, তার আর নরেনের প্রেমের মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তার জন্য হিমুর কাছে ক্ষমা চাইতেও প্রস্তুত যূথিকা। যূথিকার প্রার্থনা পূরণ হয়। সে দেখে হিমু বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। কেন হিমুর এই অন্তর্ধান? এ প্রসঙ্গে অরিন্দম গোস্বামী লিখেছেন —

> হিমাদ্রির এই অন্তর্ধান প্রমাণ করে হিমাদ্রির সেই পূর্বোক্ত উক্তিকেই – তোমাকে ভালবাসি বলে। হিমাদ্রি তার ভালোবাসার মানুষকে ভিক্ষুকের মতো হাতে পেয়ে বিবাহ প্রস্তাব ফিরিয়ে দেবার শোচনীয় ভঙ্গিতে দেখতে চায়নি। হিমাদ্রি বুঝতে পেরেছিল 'উদাসীন'-এর কন্যার পক্ষে এ জীবন গ্রহণীয় হতে পারে না – বুঝতে পেরেছিল তার অসুবিধার কথা মানুষ বলেই।[৪৩]

উদাসীন-এর আভিজাত্যের প্রাচীর ভেঙে অভিজাত যূথিকা অনভিজাত হিমুর কাছে এক অস্থির মানসিকতায় একদিকে যেমন তার প্রেমের অর্ঘ্য নিবেদন করেছে, অন্যদিকে নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য ক্ষমাভিক্ষা করতে হিমুর দরজায় গিয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে। এই ঘটনা দুটির মধ্য দিয়ে সুবোধ ঘোষ মধ্যবিত্তের আভিজাত্যকে অসার এবং অর্থহীন প্রতিপন্ন করেছেন। লেখক স্থানে স্থানে সাংকেতিকতার যথার্থ প্রয়োগ ঘটিয়ে উপন্যাসটিকে শিল্প সুষমামন্ডিত করেছেন। যেমন, 'উদাসীন' এর আত্মকেন্দ্রিকতা বর্ণনায় বাড়ির চারদিকে প্রাচীরের কথা বলা হয়েছে ...সেই পাঁচিলের উপর আবার সারি সারি লোহার সূচীমুখ স্পাইক। একটি পাখিও সে পাঁচিলের উপর উড়ে এসে বসবার মত ঠাঁই পায় না। বসতে এলেই ডানাতে স্পাইকের খোঁচা খেয়ে ছটফট করে সেই মুহূর্তে উড়ে পালিয়ে যায়।

শেষাংশে হিমুর জীবনের একাকীত্ব ও ছুটে চলাকে ব্যঞ্জনাময় করতে লেখক হিমুর বাড়ীর কাছেই যূথিকাকে দেখিয়েছেন — 'ট্রেন ছাড়া একটা একলা ইঞ্জিন ভয়ানক চিৎকার করে আর ঘন কালো ধোঁয়ার স্তবক ধমকে ধমকে উড়িয়ে দিয়ে ছুটে চলে গেল'।

সুবোধ ঘোষ তাঁর আত্মকথা 'সেদিনের আলোছায়া'য় বলেছেন যে তাঁর প্রাক্ সাহিত্য জীবনে এমন কিছু মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন, যাঁরা তাঁর অন্তরে গভীর রেখাপাত করে চিরজীবন বেঁচে ছিলেন। লেখক এও স্বীকার করেছেন যে পরবর্তীতে তাঁর সাহিত্য জীবনে এই মুখগুলো বারবার ভেসে উঠেছে। সুবোধ ঘোষ এ কথাও স্বীকার করেছেন যে তাঁর অনেক গল্প ও উপন্যাসে এই চেনা মুখগুলো কখনো আংশিকভাবে, কখনো বা সম্পূর্ণভাবে এক একটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সুবোধ ঘোষের প্রাক সাহিত্য জীবনে এমনই একটি অতি পরিচিত মুখ 'সুরেশদা'।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সুরেশদা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সুরেশদা প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী চরিত্রবান ছিলেন না। মদের নেশা ছিল, পতিতাপল্লীতে গিয়ে প্রায়ই হল্লা করতেন, ফলে পুলিশের কাছেও খুবই পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত মানবিক। তাই একদিন, নিজের জীবন বিপন্ন করে এক বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাকে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়েছিলেন। সেই ঘটনা থেকেই লেখকের মনে এই প্রত্যয় দৃঢ় হয়েছিল যে ব্যক্তি চরিত্রের দু একটি স্খলন কখনই একজন মানুষের মনুষ্যত্ব বিচারের মাপকাঠি হতে পারে না, মনুষ্যত্ব বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হতে পারে তার মানবিকতা।

আলোচ্য 'রূপসাগর' উপন্যাসে সুবোধ ঘোষ তাঁর এই বিশ্বাসকেই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন অত্যন্ত সচেতনভাবে। জীবনে চলার পথে মানুষের কতগুলো ভুলকে গুরুত্ব না দিয়ে, তার মধ্যে মহত্ব সন্ধানের চেষ্টায় উপন্যাসটিতে সৃষ্ট একটি প্রধান চরিত্র 'নিশীথ' এর মধ্যে আমরা সুরেশদার প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করি।

ছোট এই উপন্যাসটিতে চরিত্র খুব বেশি নেই। দুটি প্রধান চরিত্র নিশীথ এবং বিভূতিকে ঘিরেই বাকি চরিত্রগুলো এক ছকবাঁধা পথে আবর্তিত হয়েছে। প্রেম এবং দাম্পত্য জীবন বিষয়ক এই উপন্যাসে চার জোড়া দম্পতিকে পাদপ্রদীপের সম্মুখে এনে সুবোধ ঘোষ জীবনের মহত্ব বিচার করেছেন।

রূপসাগরের চার জোড়া নর-নারী – নিশীথ-প্রতিভা, বিভূতি-নীরাজিতা, ধীরেন বোস-সুনয়না এবং মিহির মিত্র-লিজা মিটার। নিশীথই উপন্যাসের নায়ক। নিশীথের সঙ্গে নীরাজিতার বিবাহ ঠিক হয়। কিন্তু বিভূতি নিশীথের চরিত্রের এক বিচ্যুতির কথা নীরাজিতাদের জানিয়ে দেওয়ায় বিবাহানুষ্ঠান হতে পারে নি। বিবাহের দিনই এ অঘটন ঘটে। সে দিনই অবশ্য নিশীথের বিবাহ হয়, তবে শিবদাস দত্তের কন্যা প্রতিভার সঙ্গে। পরে নীরাজিতার বিবাহ হয় আচার সর্বস্ব বিভূতির সঙ্গে। নীরাজিতা ও প্রতিভার দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের জন্য তাদের বিবাহিত জীবনও ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। দাম্পত্য জীবনে নীরাজিতা হতাশ এবং অতৃপ্ত। কারণ সে একটি পুরুষের মধ্যে প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী চারিত্রিক গুণাবলীকেই সমধিক গুরুত্ব দিয়েছে। অন্যদিকে প্রতিভা নিশীথকে বিবাহ করে সুখী ও তৃপ্ত হয়েছে। প্রতিভার এই সফল দাম্পত্য জীবনের পেছনেও রয়েছে তার এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি। কারণ, প্রতিভার 'চরিত্রের অহঙ্কার' নেই। সে গুরুত্ব দিয়েছে তার জীবনসঙ্গীর মানবিকতা বোধের ওপর। প্রতিভার জীবনেও একবার একটি বিয়ের সম্পর্ক ভেঙে গিয়েছিল এক পরোপকারী তার চরিত্রের একটি ত্রুটি পাত্রপক্ষকে ধরিয়ে দেওয়ায়।

গোটা উপন্যাসটিই ছকে বাঁধা। একদিকে চারিত্রিক গুণের আচার সর্বস্বতা অন্যদিকে মানবিকতার লড়াই। এ লড়াইকে আবার উস্কে দিয়েছে নিশীথের মানবিকতার সঙ্গে, স্ত্রী প্রতিভার মুক্ত চিন্তার উদারতা এবং বিভূতির হৃদয়হীন চরিত্রের আচারসর্বস্বতার সঙ্গে তার স্ত্রী নীরাজিতার রক্ষণশীল ভাবনা যুক্ত হয়ে। উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রগুলো, বিপরীতধর্মী দুটি প্রধান চরিত্র নিশীথ এবং বিভূতিকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। তবে এই চরিত্রগুলোর মধ্যে সুনয়নার ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। প্রতিভার উদারতা এবং মুক্ত চিন্তার সংস্পর্শে এসে সুনয়না নিজেকে শুধরে নিয়েছে, সুনয়না সুন্দর ও স্বাভাবিক হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সুনয়নার পরিবর্তনের পথ ধরেই, বিভূতিসহ উপন্যাসের সমস্ত বিপথগামী চরিত্রগুলো জীবনের সোজা পথে চলতে শুরু করেছে এবং লেখকের উদ্দেশ্য সাধন করে মানবিকতারই জয়গান গেয়েছে।

সুবোধ ঘোষের রচনার একটি বিশেষত্ব, সাংকেতিকতা, রূপসাগরেও উপস্থাপিত করা হয়েছে। রূপসাগরের ঘাট বড় পিছল বাউল গানের এই পদটি বারবারই ঘুরে ফিরে এসেছে উপন্যাসটিতে। পিছল এই ঘাটে সমস্ত চরিত্রগুলোকেই লেখক এনে উপস্থিত করেছেন। চরিত্রগুলো, যেন রূপসাগরের পার্থক্য উপলব্ধি করে এবং লেখকের ইচ্ছানুযায়ী মহত্বে উন্নীত হয়ে, মানবিক আদর্শে আস্থাশীল হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসটি পূর্বাপর আলোচনা করলে, এই সিদ্ধান্তে সহজেই পৌঁছানো যায় যে লেখক তার সৃষ্ট

চরিত্রগুলোর ভুল আচরণকে গুরুত্ব না দিয়ে চরিত্রগুলোর মধ্যে লুকোনো মহত্বেরই অনুসন্ধান করেছেন মানবিকতার আদর্শে অবিচল থেকে। তবে লেখক তাঁর ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য গোটা উপন্যাসটিকে যেভাবে পরিকল্পিত ছকের মধ্যে বেঁধে রেখেছেন তা অনেক ক্ষেত্রেই পাঠকের পূর্ণতৃপ্তির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সার্কাসের তাঁবুতে রিং মাস্টারের চাবুকের সামনে বন্য জন্তুদের প্রদর্শিত খেলার সঙ্গে গভীর অরণ্যের জীব-জন্তুদের আচরণের যে পার্থক্য থাকে, এই উপন্যাসের ছকবদ্ধ চরিত্রগুলোর গতি-প্রকৃতিতে আমরা সেই একই পার্থক্য লক্ষ করি। আর এটুকুই 'রূপসাগর'-এর সীমাবদ্ধতা।

শতকিয়া সুবোধ ঘোষের একটি ভিন্নধর্মী এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কাল থেকে স্বাধীন ভারতের নির্বাচনের প্রস্তুতিপর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত সময়সীমায় আদিবাসী জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, বিশ্বাস-অবিশ্বাস এবং টানাপোড়েন লেখক এই উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন।

আমরা জেনেছি বিহারের হাজারিবাগে লেখক জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং সেখানেই তাঁর শৈশব ও যৌবনের দিনগুলো অতিবাহিত হয়েছিল। স্বাভাবিক কারণেই তাঁর বিভিন্ন গল্প ও উপন্যাসে বিহারের আদিবাসী অধ্যুষিত লোকজীবনের এক একটি খন্ড-চিত্র উঠে এসেছে। কিন্তু এই শতকিয়া উপন্যাসে কোন খন্ডচিত্র নয়, প্রায় এক দশক কাল জুড়ে বাংলা সীমান্তবর্তী বিহারের এই অঞ্চলের মানুষ, পশু, প্রকৃতি, লোকজীবনের সংস্কার, কু-সংস্কার, মোহময় আধুনিক জীবনের হাতছানিতে অনুন্নত আদিবাসী জীবনের প্রতিক্রিয়াসহ এক পূর্ণাঙ্গ সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে। ড: শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসটি সম্পর্কে, মন্তব্য করেছেন —

> ইহাতে মানভূম অঞ্চলের আদিম-সংস্কার প্রধান জীবনযাত্রার সহিত উহার প্রকৃতি পরিবেশের এক আশ্চর্য অন্ত:সঙ্গতি ও একাত্মতা রূপ পাইয়াছে।[৪৪]

সুবোধ ঘোষের বহু আলোচিত উপন্যাস তিলাঞ্জলি এবং আলোচ্য শতকিয়ার কাহিনী দুটি মোটামুটিভাবে একই কালের প্রেক্ষাপটে রচিত। কিন্তু তিলাঞ্জলিতে লেখক যেমন রাজনৈতিক মতাদর্শের দ্বন্দ্বকে গুরুত্ব দিয়ে, দুটি ভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শের মধ্যে একটির শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণের চেষ্টা করেছেন, শতকিয়ায় তার করেন নি। শতকিয়ায় আদিবাসীদের প্রতি অত্যাচারের কথা বলা হয়েছে, তাদের অর্থনৈতিক শোষণের কথা বলা হয়েছে, আদিবাসী জীবনের বিশ্বাসের মূলে আঘাতের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কথা, আদিবাসীদের সংগঠিত আন্দোলনের কথা লক্ষ্যণীয়ভাবে অনুল্লিখিত থেকে গেছে।

এই আদিবাসীদের নিয়েই লেখা 'চতুর্থ পণিপথের যুদ্ধ' গল্পে সুবোধ ঘোষ স্টিফান হোরোর বুকে যে প্রতিবাদের আগুন জ্বেলেছিলেন, বুড়ো সোখার যে সংগ্রামী চরিত্র উপহার দিয়েছিলেন, শতকিয়া উপন্যাসের অত্যাচারিত আদিবাসী দাশুর মধ্যে সেই সংগ্রাম বা প্রতিবাদের আগুনের ফুলকিটুকুও চোখে পড়ে না।

এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় তিলাঞ্জলি রচিত হয়েছিল ১৯৪৪এ এবং শতকিয়া ১৯৫৮ সালে। এই দীর্ঘ ১৪ বছরে লেখকের রাজনৈতিক বিশ্বাসে টান ধরেছিল। প্রাক্ স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে নিজেকে কংগ্রেসের কর্মকান্ড থেকে সরিয়ে এনেছিলেন। তাই ১৯৫৮য় রচিত শতকিয়ার সুবোধ ঘোষ আদিবাসী লোকজীবনকে দেখেছেন শুধুমাত্র মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেই। কোনও রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আদিবাসীদের সমস্যা সমাধানের পথ খোঁজার চেষ্টা করেন নি।

এ কথা ভাবা অসঙ্গত হবে না, সুবোধ ঘোষ স্বাধীন ভারতের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, স্বাধীনতা

লাভের পর দেশের রাজনৈতিক ক্রিয়াকান্ডে তাঁর স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল। শুধুমাত্র রাজনীতির প্রতি মোহভঙ্গ নয়, জীবনের শেষদিকে লেখক মানুষের ওপরেও আর অখন্ড বিশ্বাস রাখতে পারেননি। তাই জীবনের প্রতি আস্থা খুঁজে পেতে লেখক শেষ জীবনে তাঁর দৃষ্টি নিবন্ধ করেছেন পশু এবং প্রকৃতির ওপর। কিন্তু একই সঙ্গে এ কথাও লক্ষ করার মত যে সুবোধ ঘোষের লেখায় সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল, খেটে খাওয়া মানুষেরই ভিড়। অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং সরল আদিবাসীরা প্রায়ই উপস্থিত হয়েছে তাঁর কথাসাহিত্যে। শতকিয়াতে আদিবাসী জনজীবন, উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে পাঠকের কাছে উন্মোচিত হয়েছে পূর্ণাঙ্গরূপে।

নির্দেশিকা

১।	সাগরময় ঘোষ	—	ভরা থাক (একসঙ্গে যোগ দেই, সেই যোগ)	পৃ: ১০৪
২।	তদেব	—		পৃ: ১০৪
৩।	দীপেন্দু চক্রবর্তী	—	ভরা থাক (সুবোধ ঘোষের কুঠার)	পৃ: ৫০
৪।	তদেব	—		পৃ: ৫০-৫২
৫।	অশ্রুকুমার বন্দোপাধ্যায়	—	ভরা থাক (সৃষ্টির মৌলিকতা, বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি	পৃ: ৯৪
৬।	তদেব	—		পৃ: ২১২
৭।	সুবোধ ঘোষ	—	একটি নমস্কারে	পৃ: ১৯
৮।	তদেব	—		পৃ: ১২৪
৯।	তদেব	—		পৃ: ১১৬-১১৭
১০।	তদেব	—		পৃ: ১৭০
১১।	তদেব	—		পৃ: ১৬৩
১২।	তদেব	—		পৃ: ২১০-২১১
১৩।	শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	—	ভরা থাক (সৃষ্টির মৌলিকতা, বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী)	পৃ: ৯৪
১৪।	তদেব	—		পৃ: ৯৫
১৫।	তদেব	—		পৃ: ৯৫
১৬।	অরিন্দম গোস্বামী	—	সুবোধ ঘোষ কথাসাহিত্য	পৃ: ১৬৭
১৭।	সুবোধ ঘোষ	—	ত্রিযামা	পৃ: ২১৯
১৮।	তদেব	—		পৃ: ২১৯-২২০
১৯।	তদেব	—		পৃ: ২৮৮
২০।	অরিন্দম গোস্বামী	—	সুবোধ ঘোষ কথাসাহিত্য	পৃ: ১৬৭
২১।	শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	—	ভরা থাক (সৃষ্টির মৌলিকতা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী)	পৃ: ৯৫
২২।	সুবোধ ঘোষ	—	গঙ্গোত্রী	পৃ: ২৩৬-২৩৭
২৩।	তদেব	—		পৃ: ২৩৮
২৪।	তদেব	—		পৃ: ৩৬
২৫।	তদেব	—		পৃ: ১৭২
২৬।	অশোক রায়	—	ভরা থাক (হিউম্যানিস্ট কথাশিল্পী)	পৃ: ২১
২৭।	সুবোধ ঘোষ	—	ত্রিযামা	পৃ: ১৭১
২৮।	শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	—	ভরা থাক (সৃষ্টির মৌলিকতা, বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী)	পৃ: ৯৬
২৯।	সুবোধ ঘোষ	—	সুজাতা (ভূমিকা)	
৩০।	অরিন্দম গোস্বামী	—	সুবোধ ঘোষ কথাসাহিত্য	পৃ: ১৭২
৩১।	সুবোধ ঘোষ	—	সুজাতা	পৃ: ১২
৩২।	তদেব	—		পৃ: ১৩
৩৩।	তদেব	—		পৃ: ২১
৩৪।	তদেব	—		পৃ: ৫০
৩৫।	তদেব	—		পৃ: ৯৯
৩৬।	তদেব	—		পৃ: ১০০
৩৭।	সুবোধ ঘোষ	—	শ্রেয়সী	পৃ: ৫০
৩৮।	তদেব	—		পৃ: ১৪২
৩৯।	অরিন্দম গোস্বামী	—	সুবোধ ঘোষ কথাসাহিত্য	পৃ: ১৯৭
৪০।	শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	—	ভরা থাক (সৃষ্টির মৌলিকতা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী)	পৃ: ৯৭
৪১।	সুবোধ ঘোষ	—	শুন বরনারী	পৃ: ১২
৪২।	তদেব	—		পৃ: ১০৪
৪৩।	অরিন্দম গোস্বামী	—	সুবোধ ঘোষ কথাসাহিত্য	পৃ: ১৮৪
৪৪।	শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	—	ভরা থাক (সৃষ্টির মৌলিকতা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী)	পৃ: ৯৭